প্রথম মুদ্রণ
শ্রাবণ, ১৩৫৯

প্রকাশক
ময়ূখ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
রঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা-৩৭

অনুবাদ-কর্মে সাহায্যের জন্ত অধ্যাপক
বিষ্ণুপদ পণ্ডার নিকট কৃতজ্ঞ।

॥ আমাদের অন্যান্য অনুবাদ-গ্রন্থ ॥

॥ ১ ॥

লাল মৃত্যুর কবলে পড়ে দেশটা ধ্বংস হচ্ছে। এ রকম ঘৃণ্য আর মারাত্মক ব্যাধি এর আগে দেখা যায়নি। এর সমস্তটুকু ক্রিয়া রক্তেরই ওপর—তার লাল রঙের ভীতিটিই এ ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর প্রভাব বিস্তার করে। প্রথমটা সারা শরীরে প্রবল যন্ত্রণা, তারপর মাথা ঝিম্ ঝিম্, সমস্ত লোমকূপ দিয়ে অজস্র রক্তক্ষরণ আর মৃত্যু। সমস্ত শরীরে, বিশেষ করে মুখের ওপর রক্তের লাল দাগ রোগীকে তার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের সাহায্য আর সহানুভূতি থেকে বহু দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। ঐ চিহ্নটি হল রোগের নিষেধাজ্ঞা যেন। আসলে এই রোগের সূত্রপাত, চূড়ান্ত আক্রমণ আর মৃত্যু সব কিছু ঘটে যেতে সময় লাগে বড়জোর আধ ঘণ্টা।

প্রিন্স প্রস্পেরো স্থির বুদ্ধি সম্পন্ন সুখী মানুষ। তিনি রোগের প্রাদুর্ভাবে ভীত হননি অথচ তাঁর রাজ্যের প্রায় অর্ধেক লোক তখন প্রাণ হারিয়েছে। উনি শেষ পর্যন্ত একদিন তাঁর বন্ধুদের ভেতর থেকে বেছে বেছে সুস্থ সবল আর হাসিখুশী হাজার খানেক ভদ্রলোক আর মহিলাকে ডেকে পাঠালেন আর তাদের নিয়ে দূরের একটা দুর্গের মত বিরাট বাড়ীতে বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন জীবন-যাপনের জন্য চলে গেলেন। প্রিন্স খুব খেয়ালী মানুষ হলেও উচ্চ শ্রেণীর রুচিবান মানুষ ছিলেন। বিরাট বাড়ীটার চারদিকে মজবুত 'উঁচু পাঁচিল দেওয়া ছিল আর ছিল একটা লোহার বড় দরজা। পারিষদদের নিয়ে প্রিন্স ভেতরে চলে আসার পর আগুন আর বিরাট বিরাট হাতুড়ী এনে দরজাটা পুরোপুরি ঝালাই করে বন্ধ করে দেওয়া হল। হতাশার কোন দুর্বল মুহূর্তে ভেতরের কোন মানুষ যাতে বাইরে বেরিয়ে যেতে না পারে তার জন্যেই এই ব্যবস্থা হল। ভেতরে খাদ্য আর পানীয়ের কোন অভাব ছিলনা। প্রিন্স প্রস্পেরোর ধারণা হয়েছিল এভাবে এঁরা সবাই ঐ ব্যাধির স্পর্শ থেকে মুক্ত

থাকতে পারবেন। রোগ নিয়ে থাকুক বাইরের জগৎ। ওর জন্যে দুঃখ বা চিন্তা কোনটাই যুক্তিযুক্ত নয়। দুর্গের ভেতর আনন্দের উপকরণ ছিল প্রচুর। ওর মধ্যে ছিল ব্যালে নর্তকী, গায়ক, সুন্দরী নারী, প্রচুর মদ, অভিনয়ের মঞ্চ এমনকি হাসির খোরাক যোগানোর জন্যে ভাঁড়ও ছিল বেশ কয়েকজন। এই সব আর নিরাপত্তার সুদৃঢ় ব্যবস্থা নিয়ে দুর্গে রইলেন প্রিন্স আর তাঁর পারিষদেরা। লালমৃত্যু রইল বাইরে। দুর্গের মধ্যে নির্বাসিত জীবন যাপনের পঞ্চম কি ষষ্ঠ মাসে প্রিন্স বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে একটা মুখোশনাচের আয়োজন করলেন। তাতে তাঁর ঐ একহাজার পারিষদ সবাই যোগ দিলেন। ওদিকে বাইরে ঠিক তখনই ঐ মহামারীর প্রকোপ ভয়ানকভাবে দেখা দিয়েছে।

মুখোশনাচের ঐ আয়োজন ইন্দ্রিয়তৃপ্তির দিক থেকে ছিল অনন্যসাধারণ। যেখানে তার আয়োজন হয়েছিল সেই কক্ষগুলোর বর্ণনা আগেই দেওয়া প্রয়োজন। এখানে সাতটা রাজকীয় স্যুইট্ ছিল। সাধারণতঃ এরকম প্রাসাদে এরকম স্যুইটগুলো একটানা একটা দীর্ঘ জায়গা জুড়ে থাকে আর প্রত্যেকটি কক্ষের দরজা হয় ভাঁজ করা। দরজাগুলোকে খুলে দেওয়ালের গায়ে পুরো ঠেকিয়ে রাখা যায় আর এতে পুরো প্রাসাদটা যে কোন দিক থেকে বিনা বাধায় দেখা যায়। আমাদের এই প্রিন্সের চিন্তাভাবনা ছিল উদ্ভট ধরণের তাই দুর্গটিও তাঁর তৈরী হয়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। কামরাগুলো এমন এলোমেলো ভাবে ছড়ানো ছিল যে একটার বেশী কামরা একবারে নজরেই পড়তো না। বিশ তিরিশ হাত দূরে দূরে বারান্দা হঠাৎ ঘুরে গেছে ভিন্ন দিকে। ডাইনে বাঁয়ে দেওয়ালের গায়ে বেশ বড় পুরোনো আমলের জানালা। তা দিয়ে স্যুইট্গুলোতে যাবার ঘুরপথ বেশ নজরে পড়ে। জানালাগুলো আবার ভিন্ন ভিন্ন রঙের। যে কামরাগুলোর মধ্যে ওই জানালাগুলো খুলছে সেই কামরার রঙের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য রাখা হয়েছে। সব জানালায় রঙীন কাচ। যেমন একেবারে পূব দিকের কামরা। ওটার রঙ

নীল, তাই জানালার কাচগুলোও নীল। পরের কামরা, তার সাজ-সজ্জা সব কিছুর রঙ ছিল বেগ্‌নীলাল, তাই ওটার জানালার কাচও ছিল ওইরকম। তৃতীয় কামরা আর তার জানালার রঙ ছিল সবুজ। চতুর্থ, পঞ্চম আর ষষ্ঠ কামরা আর তার জানালার রঙ ছিল যথাক্রমে কমলা সাদা আর বেগনী। সপ্তম কামরার রঙ ছিল কালো। ওর মোটা মোটা পর্দাগুলো পর্যন্ত ঘন কালো রঙের আর সেগুলো লুটিয়ে পড়েছিল ঐ কালো রঙের কার্পেটের ওপর। শুধু এই কামরার রঙের সঙ্গে এর জানালার সাদৃশ্য ছিলনা। এর জানালাগুলোর রঙ ছিল ঘন লাল। এই সাতখানা কামরার কোনটিতেই কিন্তু আলোর ব্যবস্থা ছিলনা। অথচ এগুলোর মধ্যে অজস্র স্বর্ণালঙ্কার ছড়ানো ছিল, কোথাও বা ছাদ থেকে ঝোলানো ছিল তার কিছু কিছু। লণ্ঠন বা মোমবাতি থেকে একটুকুও আলো পাওয়ার উপায় ছিলনা কোথাও। কিন্তু এই কামরাগুলোর মুখোমুখি লম্বা টানা বারান্দায় প্রত্যেকটি জানালার বিপরীত দিকে মস্তবড় তেপায়ার ওপর বসানো ছিল পেতলের আগুনদান। সেই আগুনের শিখা কাচের জানালার ভিতর দিয়ে কামরার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ত। এর ফলে কামরাগুলোর মধ্যে বর্ণবহুল অদ্ভুত একধরণের আলো পাওয়া যেত। পশ্চিমদিকের সব শেষের কালোরঙের কামরায় লাল জানালার ভেতর দিয়ে কালো পর্দায় যখন আগুনের রশ্মি প্রতিফলিত হোত তখন একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্যের অবতারণা করত। ও ঘরে প্রবেশকারীদের মুখের ওপর ওই আলো যে ভীষণ প্রতিচ্ছায়া নিক্ষেপ করত তাতে যে কোন ব্যক্তিই ওর ত্রিসীমানার মধ্যে যেতেও ভয় পেতো।

এই কামরারই পশ্চিম দেওয়ালে কালো কাঠের বিরাট ফ্রেম-ওয়ালা একটা দেওয়াল ঘড়ি লটকান ছিল। একঘেয়ে গম্ভীর টিক্ টিক্ শব্দ করে দোলকটার এদিক ওদিক যাওয়া, মিনিটের কাঁটা পুরো একপাক ঘুরে ঘণ্টার নির্দেশ দিলে ঘড়িটার ধাতব অন্তরের ভেতর থেকে সংগীতের মত মধুর অথচ সুউচ্চ ধ্বনির প্রবাহ বেরিয়ে আসার মধ্যে এমন একটা বৈশিষ্ট্য আর গুরুত্ব ছিল যার ফলে ঘণ্টা বেজে

ওঠবার মুহূর্তে ঐকতান বাদকের দল স্বল্পকালীন নীরবতা পালনে বাধ্য হোত, থেমে যেত দ্বৈতনৃত্যের দ্রুতপদচারণা তাদের বৃত্তপরিক্রমার মধ্যপথেই হয়তবা। আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে অকস্মাৎ ঘটত ছন্দপতন তবু ঘড়ির বাজনা বেজে চলত নিয়মিত ভাবেই। এই মুহূর্তগুলিতে যারা আনন্দোচ্ছল তাদের মুখে নেমে আসত পাণ্ডুরতা, যারা বয়োবৃদ্ধ স্বপ্নাবেশের আচ্ছন্নতায় তাদের হাত দ্রুতগতিতে পরিক্রমা করে আসত নিজেদের মুখমণ্ডল। বাজনার প্রতিধ্বনিটি মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু হালকা হাসির তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ত সকলের মুখে। একধরণের নিবুর্দ্ধিতা বা দুর্বলতারই সাময়িক প্রভাবে ওরা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল—এমনি একটা চিন্তা দ্রুতবেগে খেলে যেত গায়ক-বাদকদের মনের মধ্যে। ওরা পরস্পরের কাছে নীচুগলায় প্রতিজ্ঞা করে এর পরের ঘণ্টাধ্বনি যখন শুরু হবে তখন কোনক্রমেই এইরকম আবেগ সৃষ্টি করতে ওরা কিছুতেই দেবে না। কিন্তু তিন হাজার ছ'শ সেকেণ্ড দিয়ে গড়া ষাট মিনিট দ্রুত বেগে উধাও হয়ে যায়, ঘড়ির বাজনা আবার শুরু হয় আর ঠিক আগের মতই সব কিছুর মধ্যে ছন্দপতন ঘটে, আকস্মিকভাবে সবাই ভীরু আর চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ে।

এত সব সত্ত্বেও আনন্দোৎসবের উচ্ছলতা বিন্দুমাত্রও হ্রাস পায়নি। প্রিন্সের রুচির বৈশিষ্ট্য ছিল। কোন রঙ কী ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে সে সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল নিখুঁত। তাঁর পরিকল্পনার মধ্যে সাহসিকতা আর মাদকতা, ধ্যানধারণার মধ্যে আদিমতার ঔজ্জ্বল্য লক্ষ্য করার মতো ছিল। কেউ কেউ অবশ্য তাঁকে উন্মাদ ভাবত। তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গীরা কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করত না। প্রকৃত পক্ষে তিনি যে উন্মাদ নন এই সত্যটুকু উপলব্ধির জন্যে তাঁকে দেখা, তাঁর কথা শোনা আর সান্নিধ্যলাভের প্রয়োজন ছিল।

এই বিরাট উৎসব উপলক্ষে সাতটি ঘরের সাজসজ্জা সম্পর্কে প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন তিনিই। মুখোশনাচের প্রয়োজনগত

বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির ক্ষেত্রেও মুখ্য অবদান ছিল তাঁর। এটা ঠিক যে পুরো ব্যাপারটাই ছিল অদ্ভুত। এত আড়ম্বর, জাঁকজমক, তীব্রতা আর অলৌকিকতা সৃজিত হয়েছিল যা একমাত্র অতীতেই কিছু কিছু দেখা গিয়েছে। অসঙ্গত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট অদ্ভুত-দর্শন মানুষদের বিচিত্র কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল। সর্বত্র যে অসঙ্গতচিন্তার ছাপ পড়েছিল তাতে বোঝা যাচ্ছিল সমগ্র পরিকল্পনাটি কোন বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তিরই। সেখানে সৌন্দর্যের পাশে উচ্ছৃঙ্খলতা, উদ্ভটের সঙ্গে ভীতিপ্রদ বস্তু আর সবকিছু জড়িয়ে অনেকখানি বিরক্তিকর পরিবেশ সৃজিত হয়েছিল। তবে এ কথাও সত্যি যে ঐ সাতটি কামরার মধ্যে একটা অভূতপূর্ব স্বপ্নের জগৎ সৃজিত হয়েছিল। সে স্বপ্নালু পরিবেশ বর্ণাঢ্য হয়ে উঠেছিল বিচিত্র বর্ণময় প্রাসাদকক্ষগুলোর সাহায্যে আর তারা গতিশীল হয়ে উঠেছিল ঐকতান সঙ্গীতহিল্লোলে। এ সবের মাঝখানে নিয়মিত ভাবে ধ্বনিত হচ্ছিল ভেলভেটমোড়া কামরার কালো ঘড়িটি। কিন্তু তার ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে অন্য সব ধ্বনিই কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছিল। সমস্ত স্বপ্ন, সমস্ত আনন্দ শীতল কঠিন স্পর্শে নিষ্প্রাণ হয়ে যাচ্ছিল, আবার সেই প্রতিধ্বনিটি যাচ্ছিল মিলিয়ে, সাময়িকভাবে স্তব্ধীভূত আনন্দের হাস্যধ্বনি ছড়িয়ে পড়ছিল কামরাগুলোর মধ্যে। আবার সেই সঙ্গীত, সেই স্বপ্নালু পরিবেশ, তেপায়ার ওপর বসানো আগুনের শিখার জানালা দিয়ে কামরার মধ্যে এসে সেই অস্বাভাবিক বর্ণ-বহুলতার সৃষ্টি সবই যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠছিল পর ক্ষণেই। এখন রাত ভোর হয়ে আসছিল তবু ঐ পশ্চিমের কামরাটিতে মুখোশ-ধারীদের কেউই ঢুকতে সাহস পায়নি। রক্তবর্ণ কাচের জানালাগুলো দিয়ে গাঢ় লাল আলো কালোরঙের কামরার কালো ভেলভেটপর্দায় প্রতিফলিত হয়ে একটা বীভৎস পরিবেশ সৃষ্টি করছিল। কেউ ও ঘরের ঘন কালো কার্পেটের ওপর গিয়ে দাঁড়ালেই দূরবর্তী অন্য কামরাগুলোর আনন্দধ্বনি ছাপিয়ে ওর কানে বেজে উঠছিল ঘড়িটির চাপা অথচ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ টিক টিক শব্দ।

অন্য কামরাগুলোর মধ্যে উচ্ছল আনন্দ কিন্তু সীমাহীন উত্তেজনার মধ্যে উপচিয়ে পড়ছিল যেন। মধ্য রাত্রির ঘণ্টাধ্বনি শ্রুত হওয়া পর্যন্ত তার মধ্যে বিরাম ছিল না এক বিন্দুও। তারপরই আগে যেমন বলেছি ঠিক তেমনি ভাবেই যুগলনৃত্যের বৃত্তাকার পরিক্রমা, সঙ্গীত, সব কিছু অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। এবার কিন্তু বারোটি ঘণ্টাধ্বনির জন্যে সময় লাগল একটু বেশী তাই আনন্দোৎসবের জন্য সমবেত জনতার মধ্যে যারা একটু চিন্তাশীল তারা সেই অবসরে একটু বেশী সময়ের জন্যে চিন্তা করে নিতেও সময় পেল। ঠিক অবকাশের মুহূর্তেই, ঘড়ির শেষ ধ্বনির প্রতিধ্বনিটি মিলিয়ে যাবার পূর্বেই একটি মুখোশধারী মূর্তির দিকে নজর পড়ল অনেকেরই। এর আবির্ভাব ইতিমধ্যে কারও দৃষ্টিগোচর হয়নি তাই মৃদু কণ্ঠে এ সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে পড়ল ছড়িয়ে আর সমবেত উৎসবকারীদের ভেতর থেকে উত্থিত হল মৃদু গুঞ্জন। সে গুঞ্জনের মধ্যে অসম্মতি, বিস্ময় আর সেই সঙ্গে ভীতি আর ঘৃণা।

যে ছায়াময় ভৌতিক পরিবেশের ছবি আমি এঁকেছি তার মধ্যে খুব একটা অস্বাভাবিক দৃশ্যের অবতারণা না হলে যে বড় ধরণের উত্তেজনা সৃজিত হতে পারে না, এ কথা সহজেই অনুমান করা যায়। এই রাত্রির মুখোশনাচিয়েদের প্রায় অবাধ স্বাধীনতাই দেওয়া হয়েছিল আর প্রিন্সের পরিকল্পনারও বিস্তৃতি ছিল সীমাহীন। যারা উচ্ছৃঙ্খল তাদের হৃদয় আবেগের প্রচণ্ডতায় মাত্র আলোড়িত হতে পারে। যাদের কাছে জীবন আর মৃত্যু রসিকতারই সমার্থক, সেই সব মানুষের কাছে রসিকতার জন্যে নির্দিষ্ট কোন বিষয়বস্তুই নেই। তবু সমবেত সমস্ত মানুষই স্বীকার করতে বাধ্য হলেন বর্তমান মুখোশ-ধারীর চরিত্রে এবং পোষাকে কোন চাতুর্য বা যৌক্তিকতা ছিল না। রোগা আর লম্বা এই চেহারাটি আগাগোড়া কবরের পোষাকে আবৃত ছিল। মুখোশটি তৈরী হয়েছিল মৃতদেহের বিশুষ্ক মুখমণ্ডলের অনুকরণে। সে অনুকরণ এতই নিখুঁত হয়েছিল যে নিপুণভাবে খুঁটিয়ে দেখেও কোন ত্রুটি বার করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু

মূকাভিনেতা লালমৃত্যুর চরিত্র অনুকরণ না করলে হয়ত বা এই আনন্দার্থীরা সমর্থন না-করুক সমস্ত ব্যাপারটা সহ্য করতে পারত। সমস্ত পোষাকে রক্ত ছিটিয়ে, প্রশস্ত ভুরুতে আর মুখমণ্ডলে রক্ত মাখিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা এক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর করে তোলা হয়েছিল।

ধীর আর সংযত পদক্ষেপে দ্বৈতনৃত্যের সঙ্গে ছন্দ বজায় রেখে এই ভৌতিক মূর্তিটি এগিয়ে চলেছিল, এমন সময় ওর ওপর নজর পড়ল প্রিন্স প্রস্পেরোর। সঙ্গে সঙ্গে ওঁর সমস্ত শরীর প্রথমে ভয়ে বা ঘৃণায় থরথর করে কেঁপে উঠল। পরক্ষণেই ক্রোধে তাঁর চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল। পাশে যে সভাসদরা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'কে এ? কার এত দুঃসাহস যে এইভাবে ঈশ্বরদ্রোহী চরিত্রে অভিনয় করে? এই মুহূর্তে ওকে বন্দী করে ওর মুখোশ খুলে নাও। দুর্গ প্রাকারে কাল সূর্যোদয়ের সময় যার ফাঁসি হবে সে কে, তা আমাদের এক্ষুণি জানা দরকার।

প্রিন্স এই সময় দাঁড়িয়ে পূর্বপ্রান্তের নীলরঙের ঘরটিতে। উনি হাত নেড়ে সঙ্গীত বন্ধ করে দিয়েছিলেন অনেক আগে। এর ফলে ওঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর সবক'টি কামরার মধ্যে পরিষ্কার ভাবে ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর আদেশ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনতা কিছুটা সেই অবাঞ্ছিত প্রবেশকারীর দিকে অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল। দেখা গেল সেই অবাঞ্ছিত মুখোশধারী ধীর রাজকীয় পদক্ষেপে প্রিন্সের দিকে এগিয়ে আসছে। এমন এক অস্বাভাবিক আর অবর্ণনীয় ভীতিতে সমস্ত মানুষ অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে মুখোশধারীর গায়ে হাত দেবার শক্তিটুকুও কারো ছিল না। সে অগ্রসর হয়ে এলো আর সমগ্র জনতা একই আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে দেয়ালের দিকে সরে গিয়ে ঘরের মাঝখানে ওর জন্যে স্থান করে দিল। এগিয়ে চলল সে মুখোশধারী, চলল সেই উদ্ধত রাজকীয় ভঙ্গীতে। নীল ঘরের প্রান্তে সে পৌঁছল গিয়ে বেগনীলাল ঘরের মধ্যে। তারপর সবুজ, কমলা, সাদা আর বেগনী রঙের ঘরে পৌঁছনো সত্ত্বেও ওকে বন্দী করার কোন চেষ্টাই হলনা।

প্রিন্স প্রস্পেরো নিজের সাময়িক কাপুরুষতার জন্যে বোধহয় লজ্জিত আর ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। একটা উন্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে প্রিন্স সব ক'টি কামরা পেরিয়ে একাই ঐ মুখোশধারীর কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। ভীত সন্ত্রস্ত জনতা থেকে একজনও কিন্তু তাঁকে অনুসরণ করেনি। সেই মূর্তির তিনচার ফুটের মধ্যে যখন প্রিন্স গিয়ে পড়েছেন তখন সে কালো ভেলভেট মোড়া কামরার মধ্যে পৌঁছেছে। হঠাৎ সে ফিরে তার অনুসরণকারীর মুখোমুখি সোজা হয়ে দাঁড়ালো। হাতের তলোয়ার মেঝের ওপর খসে পড়ল আর চীৎকার করে প্রিন্সও লুটিয়ে পড়লেন মেঝের ওপর। তখন তাঁর মৃত্যু হয়েছে। সমবেত জনতা তখন হতাশার মধ্যেও সমষ্টিগত সাহস সংগ্রহ করে কালো কামরার মধ্যে দৌড়ে গিয়ে কালো ঘড়ির তলায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সেই মুখোশধারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওদের ক্রুদ্ধ হাতের মুঠোর মধ্যে ধরা পড়ল কবরখানার কাপড়চোপড় আর তাই দিয়ে বানানো মৃতব্যক্তির মুখোশ। স্পর্শযোগ্য কোন দেহই সেই পোষাকের মধ্যে ছিলনা।

লাল মৃত্যুর উপস্থিতি এবার সমষ্টিগতভাবেই স্বীকৃত হল। রাত্রের অন্ধকারে সে এসেছে চোরের মত। রক্ত সিঞ্চিত কামরা-গুলোর মধ্যে আনন্দোৎসবে যোগদানকারী প্রতিটি নরনারী একে একে মৃত্যুর শীতল কোলে লুটিয়ে পড়ল। সব শেষে স্তব্ধ হয়ে গেল সেই বিরাটকায় কৃষ্ণবর্ণ ঘড়িটি। তেপায়ার ওপর অগ্নিকুণ্ডগুলি নির্বাপিত হল। অন্ধকার, ধ্বংস আর লাল মৃত্যুর সীমাহীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হল সেখানে।

অকাল সৎকার

জীবিত অবস্থায় কবরস্থ হওয়ার প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর। আর যদি এ ধরণের দুর্ভাগ্য কারও জীবনে ঘটে, বলতেই হবে সেটি তার চরম দুর্ভাগ্য। অবশ্য জীবন-মৃত্যুর মধ্যে সীমারেখাটি অত্যন্ত অস্পষ্ট আর অনির্দিষ্ট। কে বলবে ঠিক কোন বিন্দুতে একটির সমাপ্তি, অন্যটির সূত্রপাত? কোন কোন রোগের কথা আমরা জানি যে সব ক্ষেত্রে মানুষের সাধারণ জীবনলক্ষণ সাময়িকভাবে অনুভবই করা যায় না। এগুলিকে বোধহয় ক্ষণিক বিরতি বলাই সঙ্গত। মানবদেহের মধ্যে যে বিচিত্র যান্ত্রিকক্রিয়া চলেছে এইসব ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাময়িকভাবে সেগুলি স্তব্ধ হয়ে যায়। একটা নির্দিষ্ট সময় ফুরোলেই কোন অদৃশ্য হাতের ইঙ্গিতে কলকব্জাগুলো আবার সচল হয়ে ওঠে। এ যে কী ভাবে ঘটে যায় তার কারণ আজও রহস্যাবৃত। জীবনের রজতসূত্রটি চিরদিনের জন্য ছিন্ন হয়ে যায়না বা এই সব ঘটনার মুহূর্তে মানবজীবনের স্বর্ণাধারটিও চিরকালের মত চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় না। শুধু একটি প্রশ্নই জেগে থাকে,—দেহযন্ত্রের এই সাময়িক বিরতির সময় আত্মার কী অবস্থা হয়?

যে সিদ্ধান্তেই আমরা উপনীত হইনা কেন বা কাজের প্রকৃতি যে ধরণের ফল উৎপাদন করুক না কেন, আমাদের হাতে এমন সাক্ষ্য প্রমাণ আছে যা দিয়ে প্রমাণ করা যায় যে প্রকৃত মৃত্যুর পূর্বে বহুক্ষেত্রেই মানুষকে কবর দেওয়া হয়েছে। আমাদের এবং চিকিৎসকদের সম্মিলিত অভিজ্ঞতা থেকে এ ধরণের অজস্র প্রমাণ উপস্থিত করা যায়। সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে এমন শতাধিক কাহিনী তো আমারই জানা আছে। এগুলির মধ্যে বাল্টিমোর শহরের সাম্প্রতিক ঘটনাটি তার আপন বৈশিষ্ট্যে আমাদের স্মৃতির মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে। ঐ ঘটনা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই

ব্যাপক বেদনাজনক উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। কংগ্রেসের একজন সদস্য হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন আর চিকিৎসকেরা তাঁকে সুস্থ করে তুলতে সম্পূর্ণরূপেই ব্যর্থ হন। দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর তাঁর মৃত্যু ঘটে—অন্তত মৃত্যু হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। তাঁর মৃত্যু হয়নি এরকম সন্দেহ পোষণ করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না। নাড়ির গতি স্তব্ধ হয়ে শরীরের উত্তাপ পুরো-পুরি চলে গিয়েছিল, তাছাড়া জ্যোতিহীন চোখ, বিবর্ণ অধরোষ্ঠ আর মুখের আকৃতিগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মৃত্যুর সমস্ত প্রমাণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কবরে নামিয়ে দেওয়ার আগে তিনদিন দেহটিকে ঘরে শুইয়ে রাখা হয়েছিল আর এর মধ্যেই ওটা পাথরের মত শক্ত হয়ে গিয়েছিল। দেহটিতে পচনক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে যে মুহূর্তে সবাই সন্দেহ করেছেন, সেই মুহূর্তেই দেহটিকে কফিনে পোরার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কফিনটিকে এরপর পারিবারিক ভল্টের মধ্যে তুলে রাখা হয়। তিন বছর পর কফিনটি বার করে নেবার জন্যে দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে মৃত মহিলার স্বামী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। ভল্টের দরজা খোলার মুহূর্তেই সাদা পাথরের টুকরোর মত কিছু জিনিস তাঁর হাতের ওপর এসে পড়ে। তাঁর মৃত পত্নীর কঙ্কাল ছিল সেগুলো। শবাচ্ছাদনের বস্ত্রটিও ছিল অবিকৃত।

খুব সতর্কতার সঙ্গে অনুসন্ধান চালিয়ে বোঝা যায় যে তাঁকে কফিনে পুরে দেবার দিন দু'য়েকের মধ্যেই তিনি বেঁচে ওঠেন। বেঁচে ওঠার পর কফিনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার যে প্রাণান্তকর চেষ্টা তিনি করেন তারই ফলে ওটা উঁচু তাক থেকে মেঝেতে পড়ে যায়। এর ফলে কফিনটা ভেঙে যায় আর মহিলাটি তা থেকে সহজেই বেরিয়ে পড়েন। ভল্টের মধ্যে তেলভর্তি একটা লণ্ঠন ভ্রমক্রমে থেকে গিয়েছিল। এখন কিন্তু ওর মধ্যে একবিন্দু তেলও ছিল না। হতে পারে যে পুরো তেলটুকু শুকিয়ে গেছে। ভল্টের মধ্যে নেবে যাবার যে ধাপগুলো তারই ওপরটিতে

কফিনের একটা বড় কাঠের টুকরো পড়ে ছিল। বোঝা গেল ওইটে দিয়ে ভল্টের লোহার দরজায় আঘাত করে মহিলাটি বাইরের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। এরপর হয় ভয়েই নয়ত দীর্ঘকাল মূর্ছা যাবার ফলে তাঁর মৃত্যু হয়েছে! মেঝেতে পড়ে যাবার সময় ওঁর কাপড় একটা লোহার পেরেকে বেধে যায়, তাই সোজা দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় দেহটা পচে নষ্ট হয়ে যায়।

১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে এই ধরণেরই এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল যাতে আমরা প্রমাণ পেয়েছিলাম যে সত্য ঘটনা গল্প-উপন্যাসের চাইতেও কখনো কখনো অবিশ্বাস্য মনে হয়। এ গল্পের নায়িকা কুমারী ভিক্টোরাইন লাফোর্কেড এক বিখ্যাত বিরাট ধনী পরিবারের সুন্দরী কন্যা। প্যারিসের এক দরিদ্র সাংবাদিক ও সাহিত্যিক জুলিয়েন বোসেট ছিলেন ঐ লাফোর্কেডের অন্যতম পাণিপ্রার্থী। বোসেটের প্রতিভা আর অমায়িক ব্যবহারের দরুন মেয়েটি ওঁর প্রতি আকৃষ্ট হয় আর তাঁকে ভালবাসতে শুরু করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওর নজর পড়ে ধনী আর রাজনীতিবিদ মঁসিয়ে রেনেলের ওপর। বিরাট ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী লাফোর্কেড প্রতিপত্তিশালী রেনেলকেই বিয়ে করেন। বিয়ের পর কিন্তু এই ভদ্রলোক মেয়েটিকে যে শুধু অবহেলা করতে থাকেন তাই নয়, যথেষ্ট পরিমাণে দুর্ব্যবহারও আরম্ভ করেন। কয়েকটা বছর শোচনীয় জীবন কাটাবার পর লাফোর্কেডের মৃত্যু হয়। বলা উচিত যে যারা সে সময় তাকে দেখেছিল তারা মেয়েটির শরীরে মৃত্যুর লক্ষণই দেখেছিল। ওর কফিন কিন্তু ভল্টে রাখা হয়নি, গ্রাম্য কবরখানায় সেটি সমাহিত হয়। যদিও হতাশায় পুরো ভেঙে পড়েছিলেন তবু বোসেটের জীবনে কুমারী লাফোর্কেডের প্রেম এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল যে দূর গ্রামে গিয়ে কবর থেকে মেয়েটির অদ্ভুত সুন্দর চুলের একটি গুচ্ছ সংগ্রহ করার সঙ্কল্প করেন। গাঁয়ে পৌঁছে দুপুর রাতে কবর খুলে বোসেট চুলের গুচ্ছ নিতে গিয়ে মেয়েটির চোখের দিকে

তাকিয়ে চমকে ওঠেন। আসলে মেয়েটির তখনো মৃত্যু হয়নি। শরীর থেকে প্রাণসত্তা পুরোপুরি চলে যায়নি বলেই প্রেমিকের স্পর্শে সে যেন ঘুমের থেকে জেগে উঠেছিল। বোসেট'তাড়াতাড়ি মেয়েটিকে পাশের একটা বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করে তোলেন। লাফোর্কেড বোসেটকে চিনতে পারে আর যতদিন না তার শরীর পুরো সেরে ওঠে ততদিন তাঁরই কাছে থাকে। লাফোর্কেডের নারীহৃদয় অকৃতজ্ঞ ছিল না তাই নবলব্ধ জীবনের সমস্তটুকু প্রেম সে বোসেটকেই অর্পণ করেছিল। সে যে জীবন ফিরে পেয়েছে এ খবর প্রচার না করে বা স্বামীর কাছে ফিরে না গিয়ে সে বোসেটের সঙ্গে আমেরিকা চলে যায়। বিশ বছর পরে ওরা যখন প্যারিসে ফিরে আসে তখন মেয়েটির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ওদের ধারণা ছিল কেউ লাফোর্কেডকে চিনতে পারবেনা, কিন্তু আশ্চর্য! প্রথম দর্শনেই মঁসিয়ে রেনেল ওকে চিনতে পারলেন আর স্ত্রী হিসেবে দাবী করে বসলেন। শেষ পর্যন্ত আদালতের রায় গেল লাফোর্কেডের পক্ষে। বিচারক ঘোষণা করলেন, ঘটনার বৈশিষ্ট্য এবং সুদীর্ঘকাল স্বামীর কাছ থেকে দূরে থাকার ফলে আইনত মেয়েটির ওপর রেনেলের অধিকার নষ্ট হয়ে গেছে।

লেইপসিকের 'সার্জিক্যাল জার্নাল' একটি বিখ্যাত পত্রিকা। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সংখ্যায় এই পত্রিকা এই ধরণের আর একটি ঘটনার খবর দিয়েছে।

গোলন্দাজ বাহিনীর একজন বেশ লম্বা চওড়া চেহারার অফিসার একটা দুষ্টু ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় বেশ আঘাত পান। মাথার খুলি একটুখানি জখম হওয়া সত্ত্বেও ওঁর সম্পর্কে বিপদের কোন আশঙ্কা চিকিৎসকেরা করেন নি। যাই হোক শেষ পর্যন্ত মাথায় অপারেশন করা হল, রক্তমোক্ষণ আর অন্যান্য সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হল, কিন্তু রোগী ধীরে ধীরে গভীর সুপ্তির মধ্যে তলিয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত সকলেই ধরে নিলেন তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

আবহাওয়া তখন ছিল উষ্ণ আর অস্বাভাবিক ব্যস্ততার মধ্যে তাঁকে একটা সাধারণ কবরখানায় সমাহিত করা হয় এক বৃহস্পতিবার। পরের রোববার স্বাভাবিকভাবেই সেখানে বহুলোকের সমাগম ঘটে। সেদিন দুপুরে হঠাৎ কবরখানায় প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। একটি চাষী বলে যে সে যখন অফিসারটির কবরের কাছে বসেছিল তখন মাটির ভেতর থেকে একটা সাড়া পেয়েছে। তার দৃঢ় ধারণা যে তলা থেকে কেউ বাইরে আসার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। প্রথমটা বড় কেউ একটা ওর কথায় কান দেয়নি। সে কিন্তু ছেড়ে কথা কইবার পাত্র নয়। সে যে সত্যি কথাই বলছে এটা প্রমাণ করার জন্য সে ভীষণ চেঁচামেচি করে। ফলে উপস্থিত লোকজনদের মনের পরিবর্তন হয়। তাড়াতাড়ি কোদাল গাঁইতি এনে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হোল। কবরটা মোটেই গভীর ছিল না তাই একটুখানি খোঁড়বার পরই ওর ভেতর থেকে একটা মাথা বেরিয়ে এলো। ওকে দেখে মৃত বলেই মনে হচ্ছিল। বেচারা কবরের মধ্যে কফিনের ভেতর উঠে বসেছিল আর ওর প্রাণপণ চেষ্টায় কফিনটা ভেঙেও গিয়েছিল।

তাড়াতাড়ি ওকে পাশের একটা হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর ওখানে মানুটিকে জীবিত বলেই ঘোষণা করা হয়। অবশ্য চিকিৎসকরা একথা বলেন যে সাময়িকভাবে ওর হৃদ্‌স্পন্দনের বিরতি ঘটেছে। কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় সে সেরে ওঠে, পরিচিতদের ঠিকমত চিনতে পারে আর কবরের মধ্যেকার দুঃখময় ভয়াবহ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেয়। অবশ্য তখনো তার বাচনভঙ্গীর মধ্যে জড়তা ছিল।

ওর বর্ণনা থেকেই এইটি প্রতিপন্ন হয় যে ওকে যখন সমাহিত করা হয় তখনো ওর চেতনা ছিল। পরে অবশ্য সে চেতনা হারায়। অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে হালকা রন্ধ্রবহুল মাটি দিয়ে অল্প নীচে কফিনটি চাপা দেওয়া হয়, ফলে ওর মধ্যে বাতাস অনায়াসে যেতে পেরেছে। কবরের ওপরে মানুষের চলাফেরার শব্দ পেয়ে সে প্রাণপণে তার খবর পৌঁছে দিতে চেয়েছে। আসলে ঐ চলাফেরার শব্দই ওর ঘুম

ভাঙিয়েছিল কিন্তু তার পরমুহূর্তেই নিজের অবস্থা বুঝতে পেরে সে ভীষণ ভয় পেয়ে যায়।

পত্রিকায় বলা হয়েছে যে রোগী বেশ স্বাভাবিকভাবেই সেরে উঠছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাতুড়ে বৈদ্যগিরিতেই বেচারা মারা যায়। কৃত্রিম উপায়ে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে তাকে তাড়াতাড়ি সারিয়ে তোলবার চেষ্টা করার ফলে তারই আকস্মিক প্রচণ্ড ক্রিয়ায় রোগীর মৃত্যু হয়।

বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্য নেবার প্রসঙ্গে আমার আর একটা কাহিনী মনে পড়ছে। কাহিনীটি অদ্ভুত ধরণের হলেও বহুপরিচিত। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে এক আইনজীবী যুবককে দু'দিন পরে কবর থেকে বার করে এই প্রক্রিয়ায় বাঁচিয়ে তোলা হয়। ঘটনাটা এমন ভাবে প্রচারিত হয়েছিল যে লণ্ডনে যে কোন আলোচনার বিষয়বস্তুই ছিল তখন এই জীবনদান প্রসঙ্গ।

মিঃ এডওয়ার্ড স্টেপলটন টাইফয়েড আর তার আনুষঙ্গিক কতকগুলো উপসর্গের কবলে পড়ে মারা যান। মৃত্যুর সময় তাঁর ঐ বিশেষ উপসর্গগুলো সম্পর্কে চিকিৎসকেরা অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠেন, তাই মৃত্যুর পর দেহের ওপর অপারেশন করে পরীক্ষা করার জন্যে তাঁর বন্ধুবান্ধবদের অনুমতি চাওয়া হয়। সে অনুমতি কিন্তু পাওয়া গেল না। এ সব ক্ষেত্রে চিকিৎসকেরা কবর থেকে শবদেহ বার করে এনে পরে সময়মতো অপারেশনের সাহায্যে ওঁদের পরীক্ষার কাজ করেন। লণ্ডনে মৃতদেহ বার করে দেবার লোকের অভাব নেই। ওদেরই কারো সাহায্যে মৃত্যুর তিনদিন পরে আটফুট গভীর কবর থেকে স্টেপলটনের মৃতদেহ বার করে একটা বেসরকারী হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে আসা হয়।

মৃতদেহের পেটের ওপর ছুরি দিয়ে একটুখানি কাটার পর দেখা যায় যে দেহের বিন্দুমাত্র বিকৃতি ঘটেনি। সেই মুহূর্তে ব্যাটারী লাগিয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারের চেষ্টা করেন চিকিৎসকেরা। বার

বার চেষ্টা করে দেখা গেল দেহের মধ্যে কয়েকবার আক্ষেপ সৃষ্টি করা ছাড়া এই প্রক্রিয়াগুলিতে অন্য ফলোদয় হচ্ছে না।

নানারকম পরীক্ষায় অনেক সময় অতিবাহিত হয়েছিল। তখন প্রায় ভোর হয় হয়। স্থির করা হল যে আর কালবিলম্ব না করে শবব্যবচ্ছেদের কাজ শুরু করা দরকার। একটি ছাত্র কিন্তু এই পরীক্ষায় খুব উৎসাহী ছিল। তার এ সম্বন্ধে কতকগুলো নিজস্ব ধারণা ছিল। সে আর একবার বুকের পেশীগুলিতে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চার করে ফলাফল পরীক্ষা করে দেখতে চাইল। তাড়াতাড়ি বৈদ্যুতিক ক্রিয়া সঞ্চারিত করাও হল। মৃতব্যক্তি সেই মুহূর্তে টেবিলের ওপর থেকে নেমে মেঝেতে পায়চারী আরম্ভ করলেন, আর এদিক ওদিকে দেখার পর কথাও বললেন। ওঁর কথা বোঝা যাচ্ছিল না, তবে উচ্চারণে কোন জড়তা ছিল না। কিছুক্ষণ এইভাবে কথা বলার পর উনি মেঝের ওপর আছড়ে পড়লেন।

প্রথমটায় উপস্থিত সবাই ঘাবড়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু ঐ রোগীর জন্যে সেই মুহূর্তেই প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তোলার আবশ্যকীয়তাই ওঁদের আবার চাঙ্গা করে তোলে। আসলে মিঃ স্টেপলটনের মৃত্যু হয়নি, উনি সংজ্ঞা হারিয়েছিলেন মাত্র। ইথার ব্যবহারের পর তাঁর সংজ্ঞা ফিরে এলো, তিনি সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে আত্মীয়বন্ধুদের কাছে ফিরে গেলেন। পাছে তাঁর শরীরে আবার কোন উপসর্গ দেখা দেয় এই জন্যে কিছুদিন পর্যন্ত তাঁর এই পুনর্জন্ম-লাভের ঘটনাটি গোপন রাখা হয়েছিল। পরে যখন আত্মীয়েরা মিঃ স্টেপলটনকে ফিরে পান তখন তাঁরা কী পরিমাণে আনন্দিত হয়েছিলেন তা সহজেই অনুমান করা যায়।

এই ঘটনার সবচাইতে রোমাঞ্চকর অংশটি মিঃ স্টেপলটনের কাছ থেকেই জানা যায়। উনি বলেছেন যে পুরো ঘটনার কোন অধ্যায়েই উনি একেবারে চেতনাহীন ছিলেন না। অসুস্থ অবস্থায় যখন চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন তখন থেকে বেসরকারী হাসপাতালের মেঝেতে আছাড় খেয়ে পড়ে যাওয়া পর্যন্ত সমস্ত ক্ষণ

তাঁর চেতনা ছিল। অবশ্য এটা ঠিক যে সমস্ত কিছুর মধ্যে একটা অস্পষ্টতা ছিল আর সবটাই যেন গোলমেলে মনে হচ্ছিল। হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে যে কথাটা তিনি বলতে চাইছিলেন তা হোল, 'আমি বেঁচে আছি'।

এ ধরণের বহু ঘটনারই ইতিহাস এখানে উল্লেখ করা যায় অত্যন্ত সহজেই। কিন্তু মানুষের অকাল সৎকারও করা হয়ে থাকে সেইটে প্রমাণ করবার জন্যে এত ঘটনার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যখনই ভাবি যে এরকমের ব্যাপারগুলোকে ভালো করে বুঝে দেখবার শক্তি আমাদের কত কম তখনই মনে হয় এরকম ঘটনা অসংখ্য ঘটে যাচ্ছে। কোন বিশেষ প্রয়োজনে কবরখানা খোলার পর নরকঙ্কাল-গুলোকে ঠিক শায়িত অবস্থায় পাওয়া যায় নি, এ অভিজ্ঞতার পরিমাণ অল্প নয়। ফলে আমাদের মনে একটা ভয়াবহ সন্দেহ অবশ্যই জাগে।

আমাদের পক্ষে এগুলো যতই ভয়াবহ হোক না কেন, কবরস্থ হতভাগ্যের মৃত্যুযন্ত্রণা তার চাইতে অনেক বেশী ভয়ঙ্কর। মৃত্যুর পূর্বেই কাউকে সমাহিত করলে তাকে যে দৈহিক আর মানসিক পীড়ন ভোগ করতে হয় তা অকল্পনীয়। পৃথিবীর মুক্ত বায়ুর জন্য দুঃসহ দৈহিক আক্ষেপ, প্রদীপ শিখার শ্বাসরোধকারী প্রভাব, শবাচ্ছাদন বস্ত্রসমূহের অসহনীয় স্পর্শ, কফিনের হিমশীতল আলিঙ্গন, চিরন্তন রাত্রির নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, সমুদ্রের গভীরতম নিস্তব্ধতা, দেহটিকে ধ্বংস করে ফেলার জন্যে অজস্র মৃত্যু-কীটের দুঃসহ স্পর্শ আর সেই সঙ্গে শষ্পশ্যাম পৃথিবীর প্রিয়জন—যারা অবহিত হলে এই মুহূর্তেই সমাহিত মানুষটিকে উদ্ধার করবার জন্যে ছুটে আসত, সব মিলেমিশে যে চিন্তা ঐ মানুষটিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, কোন অসীম সাহসী মানুষও তার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবে না। পৃথিবীর বুকের ওপর এইসব মর্মান্তিক যন্ত্রণার কোন খবরই আমরা রাখি না। কল্পনা করতে পারি না মাটির তলায় নরক যন্ত্রণার যে স্বরূপ তার অর্ধাংশও। এ ঘটনাগুলোর কাহিনীতে আমাদের আকর্ষণ অপরিসীম

আর শ্রদ্ধামিশ্রিত ভীতিও আছে প্রচুর শুধু এই কারণেই যে এই কাহিনীতে আমরা আস্থাবান। সব শেষের যে কাহিনীটি বলছি তা সম্পূর্ণভাবেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-নির্ভর।

বেশ কয়েক বছর ধরে আমি যে বিশেষ একটি রোগে ভুগছি চিকিৎসকরা তাকে অন্য কোন নির্দিষ্ট নামে অভিহিত না করে শারীরিক কাঠিন্যযুক্ত সাময়িক চেতনালোপ বলছেন। কেন এই ব্যাধির আক্রমণ ঘটে বা প্রকৃত উৎস কোথায় সে সব কিছুই রহস্যাবৃত থাকা সত্ত্বেও ব্যাধির আক্রমণ মুহূর্তে কী ঘটে সে সম্পর্কে সকলেই ওয়াকিবহাল। বিভিন্ন সময়ের আক্রমণগুলির মধ্যে পার্থক্য শুধু পরিমাণগত। কখনো কখনো রোগী একটি দিন, তারও কম সময়ের জন্যে ভয়ানক ক্লান্তিজনিত অবসন্নতার মত অচেতন থাকে। এই অচেতন অবস্থায় তার অতিক্ষীণ হৃদ্‌স্পন্দন ছাড়া দৈহিক স্পন্দন আর মোটেই থাকে না। সামান্যতম দৈহিক উত্তাপ, চিবুকের ওপর কোন একটি কেন্দ্রে কিঞ্চিৎ পরিমাণ অক্ষুণ্ণ দেহবর্ণ আর অধরোষ্ঠের কাছে দর্পণ সংলগ্ন করে ফুস্‌ফুসের ক্ষীণতম ক্রিয়াও লক্ষ্য করা যেতে পারে। কখনো কখনো কয়েক সপ্তাহ বা মাস পর্যন্ত এই চেতনাহীন অবস্থার জের চলে। এই সময় অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের খুঁটিনাটি পরীক্ষা বা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের সাহায্যেও এই অবস্থার সঙ্গে মৃত্যুর লাক্ষণিক পার্থক্য বোঝা যায় না। বন্ধুবান্ধবেরা এ ধরণের আক্রমণ সম্পর্কে পূর্ব থেকেই সচেতন আর দেহে পচনক্রিয়ার লক্ষণ থাকে না বলেই রোগীকে অকালে সমাহিত করা হয় না। সৌভাগ্যের কথা, এসব ব্যাধির ব্যাপ্তি ঘটে ক্রম পর্যায়ে। প্রথম যখন ব্যাধির লক্ষণ দেখা যায় তখন সে সম্পর্কে মতদ্বৈধ থাকে না। এরপর সময়ের দৈর্ঘ বাড়তে থাকে আর রোগের লক্ষণগুলোও স্পষ্টতর হতে থাকে। রোগীকে যে প্রকৃত মৃত্যুর আগেই সমাহিত করা হয় না তার কারণই এই। যে হতভাগ্যের প্রথম আক্রমণটি গুরুতর প্রকৃতির তার ভাগ্যে অকাল সমাধি সুনিশ্চিত।

চিকিৎসা শাস্ত্রে এ রোগের যে ধরণের বর্ণনা আছে আমার ক্ষেত্রে

তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। কখনো কখনো বাহ্য কোন কারণ ছাড়াই আমি এলিয়ে পড়তাম আর ধীরে ধীরে চেতনাহীন অবস্থায় উপনীত হতাম। এই সময় কোন প্রকার দৈহিক যন্ত্রণা আমার থাকতো না ঠিকই, কিন্তু আমি কথা বলতে, নড়াচড়া করতে এমনকি কোন কিছু চিন্তা করতেও পারতাম না। আমার মধ্যে এক ধরণের অস্পষ্ট চেতনা কাজ করত আর তারই সাহায্যে যারা তখন আমার বিছানার আশেপাশে থাকত, তাদের উপস্থিতিটি বুঝতে পারতাম। যতক্ষণ রোগের আক্রমণ অন্তর্হিত হোত ততক্ষণ চেতনা আর চেতনহীনতার মোহানায় আমার সময় কাটত। কখনো বা নিতান্তই আকস্মিক দ্রুততার সঙ্গে আমার শরীর শীতল হয়ে যেত, আমার চেতনা সম্পূর্ণভাবেই লুপ্ত হয়ে যেত আর আমি মৃতের মত কয়েক সপ্তাহ পড়ে থাকতাম। এই সময় আমার কাছে সবই মনে হোত শূন্য, অন্ধকার আর নীরব। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তখন আমার কাছে অর্থহীন হয়ে যেত। জগৎসংসার ধ্বংস হয়ে যাওয়া আমার কাছে এমন কিছু বড় ঘটনা নয় তখন। এ সব ক্ষেত্রে ব্যাধির আক্রমণ সম্পূর্ণ আকস্মিক এবং সর্বাত্মক হলেও, আমার জ্ঞান ফিরে আসত, আনুপাতিকহারে অত্যন্ত মন্থর গতিতে। এ যেন সুদীর্ঘ নির্জন শীতরাত্রির একক ভ্রমণের পর, গৃহহীন বন্ধুহীন এক ভিক্ষুকের জীবনে ক্লান্ত মন্থর গতিতে আনন্দময় নবসূর্যোদয়ের মতো আমার দেহের মধ্যে আত্মার প্রত্যাবর্তন।

সাময়িকভাবে চেতনাহীন হওয়া ছাড়া আমার দেহে অন্য কোন প্রকার ব্যাধি ছিল না। সাধারণভাবে বরং আমার স্বাস্থ্য ভালোই ছিল। আমি তখন বুঝতে পারিনি যে আমার ঘুমের মধ্যেই ঐ ব্যাধির বীজ নিহিত। আমার ঘুম ভাঙলে আমি কখনোই দ্রুতগতিতে চেতনা ফিরে পাইনি। বেশ কয়েক মিনিট কেটে যেত আচ্ছন্ন অবস্থায়। মানসিক ক্রিয়া, বিশেষ করে স্মৃতিশক্তির প্রত্যাবর্তন ঘটত অত্যন্ত বিলম্বে।

এসবের জন্যে আমার দৈহিক কষ্ট কিছুই ছিল না, কিন্তু মানসিক

যন্ত্রণা ছিল অপরিসীম। আমার কল্পনার জগতে একটি কঙ্কাল-শালা গড়ে উঠেছিল, যার ফলে আমার আলাপ-আলোচনার মধ্যে অনিবার্য ভাবেই 'কবর', 'কীট', 'কবরের প্রস্তর ফলক' এই শব্দগুলো ব্যবহৃত হোত। মৃত্যু, অকাল সমাধি—এই সব চিন্তা আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে দাঁড়ালো। দিনের বেলা এগুলো নিয়ে চিন্তা করতাম, ফলে রাত্রে সেগুলো মনের ওপর পাথরের মত চেপে বসে থাকত। যেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসত পৃথিবীর ওপর, আমার সমস্ত শরীর শবাধারের মোমবাতির সামনে কম্পমান পালকের মত কেঁপে কেঁপে উঠত। জেগে থাকার মত শক্তি যখন আর থাকত না তখনই ঘুমুতে বাধ্য হতাম আমি। কিন্তু ঘুমুতে যাবার সময় এই ভীতিটিই প্রবল হয়ে উঠত যে হয়ত ঘুম ভাঙলে দেখব আমি কবরের মধ্যে বন্দী হয়ে পড়েছি। ঘুমের মধ্যে আমি অনতিবিলম্বেই চলে যেতাম একটা অলীক ছায়ামূর্তির জগতে, যেখানে কেবলমাত্র সমাধিক্ষেত্রের চিন্তা আমার মনের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণের পক্ষবিস্তার করে উড়ে বেড়াত। মৃত্যুর যে বিভিন্ন রূপ আমার মানসিক যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়াতো তার মধ্যে একটির কথাই এখানে উল্লেখ করছি। যদ্দূর মনে পড়ে আমি একবার চেতনাহীন অবস্থায় দীর্ঘতর সময় অতিবাহিত করে-ছিলাম। সেই অবস্থার মধ্যে হঠাৎ একটা হিমশীতল হাতের স্পর্শ অনুভব করলাম আর শুনতে পেলাম দ্রুততার সঙ্গে উচ্চারিত কিছুটা অস্পষ্ট একটি আদেশ, 'জেগে ওঠ'। ঘন অন্ধকারের মধ্যে আমি সোজা হয়ে উঠে বসলাম। যে আমাকে জাগিয়ে তুলেছিল তাকে দেখতে পেলাম না। আমি ঠিক কোথায় আছি আর কতক্ষণই বা আমার চেতনা লোপ পেয়েছিল, কিছুই স্মরণ করতে পারলাম না। স্থিরভাবে বসে থেকে আমি প্রাণপণ শক্তিতে যখন আমার স্মৃতিশক্তি ফিরে পেতে চেষ্টা করছি, তখন সেই ঠাণ্ডা হাতটি আমার কব্জি জোর করে চেপে ধরল আর তেমনি দ্রুত ও অস্পষ্ট কণ্ঠে আদেশ ধ্বনিত হোল, 'ওঠ! তুমি কি শুনতে পাচ্ছনা যে তোমাকে জেগে উঠতে বলছি?'

'কিন্তু আপনি কে'?—প্রশ্ন করলাম আমি। শোকক্লিষ্ট কণ্ঠের উত্তর শোনা গেল, 'আমার যে জগতে বাস, সেখানে কোন নাম নেই আমার। ছিলাম মানুষ কিন্তু হয়েছি দানব। ছিলাম দয়ামায়াহীন, হয়েছি স্নেহপ্রবণ। আমি যে কাঁপছি তা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। কথা বলতে গিয়ে দাঁতে দাঁত ঠেকে যাচ্ছে। কিন্তু তার কারণ আজকের এই শীতল রাত্রিটি নয়, সীমা সংখ্যাহীন রাত্রিই তার কারণ। এ অবস্থা অসহনীয়। কেন তুমি শান্তিতে ঘুমোতে পার না? তোমাদের মানসিক কষ্টের অভিঘাতে আমার শান্তি নষ্ট হয়ে যায়। তোমাদের যন্ত্রণাভোগের দৃশ্যও আমি সহ্য করতে পারিনা। উঠে দাঁড়াও। আমার সঙ্গে বাইরে রাত্রের পরিবেশে বেরিয়ে এসো। সেখানে তোমাকে কবরগুলোর ভেতরের দৃশ্য দেখাবো। বড় শোচনীয় দৃশ্য! তবু দেখ তুমি!'

যে অদৃশ্য মূর্তি আমার হাতটিকে তখনো মুঠো করে ধরে রেখেছিল, সে মুহূর্তের মধ্যে অতীত-মানব সম্প্রদায়ের সমস্ত কবর উন্মোচিত করে ফেলল। আমি তাকিয়ে দেখলাম প্রতিটি কবর থেকে মৃদু আলোর রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে আর সেই আলোতে কবরগুলোর শোকাবহ নীরব আবেষ্টনীর মধ্যে দেখতে পেলাম নিদ্রিত মানুষ আর কৃমিকীটের সহাবস্থান। কিন্তু হায়, নিদ্রিত মানুষের সংখ্যা অত্যন্ত অল্পই দেখা গেল। লক্ষ লক্ষ মানুষ মোটেই নিদ্রিতাবস্থায় ছিল না। তারা চাইছিল কবরের বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসতে। সেই চেষ্টার ফলে সমস্ত এলাকা জুড়ে একটা চাঞ্চল্য আর বেদনাময় পরিবেশ সৃজিত হয়েছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল শবাচ্ছাদন-বস্ত্রনির্গত মর্মর শব্দ। যারা তখনো নিদ্রিত তাদের কিন্তু দেহভঙ্গীর পরিবর্তন স্পষ্টই দেখতে পেলাম। সাধারণত যে অনমনীয় আর অস্বস্তিকর ভঙ্গীতে মানুষকে কবরস্থ করা হয়, তার পরিবর্তন ঘটেছিল কমবেশী প্রায় সকলেরই।

আমি যখন এই সব দৃশ্য দেখছি তখন আবার শুনতে পেলাম, 'এগুলো মোটেই কি করুণ দৃশ্য নয়?' এই প্রশ্নের উত্তর দেবার

আগেই কিন্তু সেই মূর্তি আমার হাত ছেড়ে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষীণ আলোর রশ্মি মিলিয়ে গেল। পরমুহূর্তেই সমস্ত কবরের দরজা একই সঙ্গে রুদ্ধ হয়ে গেল আর সেগুলি থেকে হতাশামিশ্রিত সমবেত কণ্ঠে প্রশ্ন ধ্বনিত হল, 'হায় ভগবান, এই দৃশ্য কি করুণ নয় ?'

এই ধরণের অলীক স্বপ্ন রাতের বেলায় দেখলেও তার প্রভাব দিনের জাগ্রত মুহূর্তগুলোকেও আচ্ছন্ন করে রাখত। এর ফলে আমার এলো স্নায়বিক দৌর্বল্য আর ভীতিপ্রবণতা। যে কোন প্রকার শারীরিক ব্যায়ামের জন্যে ঘরের বাইরে যেতে হয় বলেই আমি ঘোড়ায় চড়া এমন কি বেড়ানোও পরিত্যাগ করলাম। প্রকৃতপক্ষে যারা আমার রোগের কথা জানে তাদের ছেড়ে বাইরে পা বাড়াতেই আমার ভয় হচ্ছিল তখন। কেবল ভয় হোল এদের অনুপস্থিতিতে যদি আমি চেতনা হারাই সেই অবস্থায় হয়ত আমাকে অন্যের কবরে শুইয়ে দেবে। শেষ পর্যন্ত যারা আমার প্রিয়তম বন্ধু তারা কতটা বিশ্বস্ততার সঙ্গে আমার যত্ন নেবে, সে বিষয়েও সন্দেহ সৃষ্ট হোল। সাধারণ অপেক্ষা দীর্ঘতর সময়ের জন্য চেতনাহীন থাকলে ওরা হয়ত ধরে নেবে যে আমার চেতনা আর ফিরবে না। এমন ভয়ও করতে শুরু করলাম যে আমার অসুস্থতার সময় তারা খুবই বিব্রত হয়ে পড়ে তাই হয়ত দীর্ঘসময়ের চৈতন্যহীনতার সুযোগে তারা আমার হাত থেকে মুক্তি পেতেই চাইবে। আন্তরিক প্রতিশ্রুতি দিয়েও বন্ধুরা আমার মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে আনতে পারছিল না। ওদের দিয়ে আমি এই শপথ করিয়ে নিলাম যে আমার শরীর যতক্ষণ না পচে ওঠে আর দেহটাকে ঘরে রাখা অসম্ভব মনে না-হয়, ওরা আমাকে কবরে শুইয়ে দেবেনা। কিন্তু তবুও এই মারাত্মক ভীতি আমার রয়েই গেল। কোন রকমের সান্ত্বনাই আমি পেলাম না। আমি কিছু কিছু সাবধানতা অবলম্বন করতে লাগলাম। আমাদের যে পারিবারিক ভল্টটা ছিল সেটাতে এমন ব্যবস্থার প্রবর্তন করলাম যাতে প্রয়োজন হলে ভেতর থেকেও কেউ সেটাকে খুলে ফেলতে পারে। একটা লম্বা হাতল এমন করে লাগিয়ে

নিলাম যে কফিন রাখার জায়গা থেকে হাত বাড়িয়ে একটু চাপ দিলেই লোহার দরজা যেন খুলে যায়। ওর মধ্যে যাতে যথেষ্ট পরিমাণে আলো বাতাস যায় তার ব্যবস্থা করা হোল আর কিছু খাদ্য-পানীয় এমনভাবে রাখা থাকল যাতে আমার জন্য নির্দিষ্ট কফিন থেকে হাত বাড়িয়ে সেগুলোর নাগাল পাওয়া যায়। কফিনের ভেতর উষ্ণ আর নরম কাপড়ের আস্তরণ লাগানো হোল আর ওর ঢাকনাটায়ও ওই লোহার দরজা খোলার মত ব্যবস্থা রইল। এমন স্প্রীংয়ের কব্জা ওতে লাগানো হোল যাতে শরীরের অল্প একটু নড়াচড়াতেই কফিনের ঢাকনা পুরো খুলে যায়। এরপর ভল্টের ছাদে একটা ঘণ্টা লাগিয়ে তার দড়িটা একেবারে কফিনের ভেতর নিয়ে গিয়ে মৃতদেহের হাতের সঙ্গে জড়িয়ে রাখার ব্যবস্থা হোল। কিন্তু এসব দিয়েই কি মানুষের দুর্ভাগ্যকে সত্যিই ঠেকিয়ে রাখা যায়? এত আয়োজন, এত সাবধানতা সত্ত্বেও চিন্তার রাজ্য থেকে জীবন্ত কবরের ভীতি দূরীভূত হোল না। সেই আশঙ্কাজনিত মানসিক যন্ত্রণা আমাকে অহরহ পীড়া দিতে থাকল।

আগে যেমন ঘটেছে ঠিক তেমনি করে রোগ ভোগের পর ধীরে ধীরে চেতনা ফিরে আসতে লাগল। বিলুপ্ত চেতনার রাজ্য থেকে একটা দুর্বল আর অনিশ্চিত অস্তিত্বের জগতে প্রত্যাবর্তন ঘটতে থাকল আমার। সে প্রত্যাবর্তন এমন কূর্ম-গতির মন্থরতায় আমার মনোরাজ্যের উষালোক সৃজন করল যাতে আমার মধ্যে একধরণের নতুন অস্বস্তির সৃষ্টি ঘটল। চেষ্টাহীন, যত্নহীন, নৈরাশ্য-পীড়িত একধরণের মানসিকতা আমাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই অস্বস্তির যন্ত্রণা সহ্য করতে বাধ্য করল। এরপর দীর্ঘ বিশ্রামের অবসানে শুরু হোল কানের মধ্যে ঘণ্টাধ্বনি, আবার কিছু সময়ের পর সমস্ত শরীরের মধ্যে একটা অবর্ণনীয় অনুভূতি। এরপর কিছু সময় অতিবাহিত হোল অবিচ্ছিন্ন শান্ত আনন্দময় মানসিকতার মধ্যে কিন্তু তারপরই চলে গেলাম বিস্মৃতির অন্ধকারময় জগতে। এ থেকে মুক্তি এলো অনেক পরে। এ সময় চোখের পাতাগুলো

নড়ে উঠত আর মারাত্মক অথচ অনিশ্চিত ভাতির আত্যন্তিকতায় দেহের সমস্ত রক্ত যেন বুকের মধ্যে গিয়ে সঞ্চিত হয়ে যেত। একটু চিন্তা, একটুখানি স্মৃতির প্রত্যাবর্তন, তারপর স্পষ্টতর চেতনার রাজ্যে ফিরে গিয়ে অনুভব করা যে এ জাগরণ সাধারণ নিদ্রার আলিঙ্গন থেকে নয়, চেতনাশূন্যতার আক্রমণ থেকে। সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের মত আবার সেই ভীতি ফিরে আসত, আবার আচ্ছন্ন করে ফেলত আমার চিন্তা জগৎকে।

অলস কল্পনাগুলোর এই সব মুহূর্তে আমি নড়াচড়াও করতাম না শুধু এই জন্যেই যে তা করার সাহস আমার থাকত না। কে যেন আমার কানে কানে বলে যেত যে আমি বেঁচে আছি—তবু আমি অচল অনড় অবস্থায় পড়ে থাকতাম। এই দীর্ঘ বিমূঢ় অবস্থার অবসানে হতাশা নিয়েই চোখ মেলে চাইতাম। আমি জানতাম যে ব্যাধির আক্রমণ থেকে আমি সাময়িকভাবে মুক্ত তবু আমার চারদিকে শুধু অন্ধকারই দেখতাম আমি। আমার দৃষ্টি-শক্তি অক্ষত থাকা সত্ত্বেও সেই নিরন্ধ্র অন্ধকারের যন্ত্রণা আমাকে সহ্য করতেই হোত। বুকের ওপর জগদ্দল পাথরের বোঝা অনুভব করতাম। শুকনো জিভ আর ঠোঁট নেড়ে চেঁচিয়ে উঠতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত গলা দিয়ে কোন শব্দই বেরুত না। আমার প্রাণপণ চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যেত।

গলা ছেড়ে কেঁদেও উঠতে পারতাম না আমি। তা করবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখেছি মৃত ব্যক্তির মতই আমার মাড়ি দু'টো আটকে আছে। মনে হোত আমি কোন কঠিন বস্তুর ওপর শুয়ে আছি আর আমার চারপাশও সেই রকম বস্তু দিয়ে আটকানো। এ পর্যন্ত আমার শরীরে কোন চাঞ্চল্য ছিল না। এখন আড়াআড়িভাবে হাত দু'টোকে আলগা করে নিয়ে ওপরে ওঠাতে চাইলাম কিন্তু পারলাম না। আমার মুখের ওপর প্রায় ইঞ্চি ছ'য়েক উঁচুতে নিরেট কাঠের কোন জিনিসে সেগুলো গিয়ে ঠেকল। এখন আর আমার সন্দেহ রইল না যে আমি কফিনের মধ্যেই রয়েছি।

আমার নিঃসীম দুঃখের জগতে হঠাৎ আশার আলো জ্বলে উঠল। যে সব সাবধানতা আমি অবলম্বন করেছিলাম, সেগুলোর কথা মনে পড়ল এক এক করে। শরীরটাকে একটুখানি নড়িয়ে আমি প্রথমেই কফিনের ডালাটা খুলে ফেলতে চাইলাম কিন্তু তা সম্ভব হোল না। আমার হাতে নিশ্চয় ঘণ্টার দড়ি জড়ানো আছে। আমি চাইলাম সেটি স্পর্শ করতে। তার নাগাল পেলাম না আমি। আশার আলো নিভে গেল পর মুহূর্তেই আর সেখানে বিস্তৃত হোল বিজয়ী হতাশার স্থায়ী রাজত্ব। কোথায় গেল অত্যন্ত সাবধানে বানিয়ে রাখা সেই আরামদায়ক উষ্ণ নরম আস্তরণ? কিছু নেই। তার বদলে আঘ্রাণ পেলাম ভিজে মাটির সুতীব্র দুঃসহ গন্ধের। এরপর তো নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে বিলম্ব হওয়া উচিত নয়। আমার কফিন পারিবারিক ভল্টের মধ্যে নেই। বাড়ীর বাইরে কখনো কোন এক জায়গায় আমি চেতনা হারিয়েছি সম্পূর্ণ অপরিচিতদের মাঝখানে। ওরা সাধারণ একটা কফিনের মধ্যে বন্ধ করে ভালোভাবে পেরেক ঠুকে মরা কুকুরের মতো অজ্ঞাত কোন কবরের অনেক—অনেক গভীরে পুঁতে ফেলেছে আমাকে।

এই ভীতি যখন হৃদয়ে পূর্ণ বিশ্বাসের স্তরে গিয়ে পৌঁছল তখন আর একবার চেঁচিয়ে কেঁদে উঠতে চাইলাম আমি। এবার কিন্তু আমি সফল হ'লাম। ভূগর্ভস্থ রাত্রির বুক চিরে একটা দীর্ঘ আর্তনাদ ধ্বনিত হোল। একটি রূঢ় কণ্ঠস্বর পর মুহূর্তেই শোনা গেল, 'হ্যালো কে সে?' ঠিক পরেই দ্বিতীয় কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'কিসের গোলমাল শুরু হোল এখানে?' তৃতীয় কণ্ঠস্বরও শোনা গেল, 'বেরিয়ে যাও সব এখান থেকে।' এইখানেই থেমে গেল না সবাই, পরের কণ্ঠস্বর প্রশ্ন করল, 'এ রকম বিশ্রীভাবে যে সব চেঁচিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তার মানেটা কী?' এর পরমুহূর্তে কয়েকজন রুক্ষমূর্তির মানুষের একটি দল দেখে আমি নিতান্তই ভীত হয়ে পড়লাম। আমি জেগেই ছিলাম তাই আমাকে নতুন করে জাগিয়ে তোলার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু ওরা আমার স্মৃতিশক্তির প্রত্যাবর্তনে সহযোগিতা করল।

ঘটনাটা ঘটেছিল ভার্জিনিয়া এলাকার রিচমণ্ডের কাছে। জেমস্ নদীর তীর বরাবর বেশ কয়েক মাইল নীচের দিকে এক বন্ধুর সঙ্গে আমি সেদিন শিকারে বেরিয়েছিলাম। সন্ধ্যের দিকে আমরা হঠাৎ একটা ঝড়ের মুখে পড়ি। পাশেই নদীতে একটা নৌকো নোঙর করা ছিল। আমরা সেখানে রাতের মতো আশ্রয় নিলাম। নৌকোটাতে বাগানের জন্য ছাতাধরা ভেজা মাটি ভর্তি ছিল। দুটো মাচানের মধ্যে আমি একটা শোবার জন্যে দখল করলাম। ওটা শোবার মত জায়গাই নয়। চওড়ায় হাতখানেক আর নৌকোর তলা থেকে ও হাতখানেক উঁচুতে ওই মাচানে শুতে গিয়ে নিজেকে অনেকখানি সঙ্কুচিত করে নিতে হয়েছিল আমাকে। অবশ্য ঘুম আমার হয়েছিল বেশ ভালোই কিন্তু আমি যা দেখছিলাম তা পুরোটাই আমার পরিবেশ, স্বপ্ন নয়। এটা ঠিক যে কোন কিছু নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা আমার অভ্যাস। এর ফলে আমার পরিবেশ আর দৈহিক অসুবিধেগুলো নিয়ে আমি নিজের মত করে চিন্তা করে চলেছিলাম। আগেই বলেছি ঘুম থেকে জেগে ওঠার পরও স্মৃতিশক্তির পুরোটা ফিরে পেতে চিরকালই আমার বিলম্ব হোত। যারা আমাকে জাগিয়ে তুলেছিল তারা ছিল সবাই নৌকোর লোক। নৌকো থেকে বাগানের জন্যে মাটি নাবিয়ে নেবার জন্য তারা নিযুক্ত হয়েছিল। যে গন্ধ আমার নাকে লাগছিল তা ছিল ঐ নৌকোর মধ্যেকার মাটিরই। মাথায় রাত্রে পরবার মত টুপী ছিলনা বলে আমিই মাথা আর চিবুকের ওপর দিয়ে নিজের রুমালখানাকে বেঁধে নিয়েছিলাম।

ঐটুকু সময়ের মধ্যে যে যন্ত্রণাভোগ আমাকে করতে হয়েছিল তা কবরের যন্ত্রণারই সমতুল্য। তেমনি জঘন্য আর ভীতিপ্রদ কিন্তু এই চরম যন্ত্রণার অধ্যায় থেকেই জন্ম নিয়েছিল একটি অপূর্ব সুন্দর পরিচ্ছেদ। যন্ত্রণার অসহনীয় অবস্থার মধ্যে আমার সব কিছুই সম্পূর্ণ ভাবে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। আমার দেহমন এক নতুন অধ্যায়ে উপনীত হল। আমি বিদেশে চলে গেলাম। প্রচুর পরিমাণে ব্যায়াম করা শুরু করলাম আর এর ফলে নির্মল

আনন্দ উপভোগ করার শক্তি অর্জন করলাম আমি অল্প দিনের মধ্যেই। মৃত্যুপ্রসঙ্গ বর্জন করে আমি অন্যান্য প্রসঙ্গ নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করলাম। চিকিৎসা সংক্রান্ত যে বইখানা আমার ছিল সেটি আমি পুড়িয়েই ফেললাম। 'রাত্রির চিন্তা' বা এতক্ষণ যে সব কাহিনীর কথা বললাম এসব কাহিনী পরিপূর্ণ পুস্তক পুস্তিকা আর আমি খুলিনি। সংক্ষেপে বলা যায় যে আমি আমার জীবনের পথ সম্পূর্ণভাবেই পরিবর্তিত করে মানুষের মত বাঁচার চেষ্টায় নিযুক্ত হলাম। সেই রাত্রির পর থেকে মৃত্যুর চিন্তা আর কবরভীতি চিরদিনের মত অন্তর্হিত হোল আর সেই সঙ্গে মুক্ত হলাম চেতনালোপ ঘটিত ব্যাধি থেকে।

যুক্তিনির্ভর চিন্তাও কোন কোন দুর্বল মুহূর্তে এই জগতে নরকের চিত্রই দেখে। কিন্তু এ কথাও সত্যি যে মনের মধ্যে যে সব গুহা-গহ্বর আছে তার সন্ধান নিতে গেলে তাকে শাস্তি পেতেই হয়। কবরখানার ভীতিকে তো সম্পূর্ণ অলস কল্পনা কখনই বলা যায় না। তবুও প্রার্থনা করি, ওখানে যারা আছে তারা শান্তিতে নিদ্রা যাক্, নইলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য।

ঘূর্ণাবর্তের অতলে

সব চাইতে উঁচু পাহাড়ের চূড়োয় আমরা তখন পৌঁছে গেছি। বৃদ্ধ বড্ড বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কয়েক মিনিট তিনি কোন কথাই বলতে পারছিলেন না।

'খুব বেশী দিন আগের কথা নয়', বৃদ্ধ বলে উঠলেন, 'তোমাকে, এমন কি আমার কনিষ্ঠ পুত্রটিকেও আমি এই পাহাড়ের চূড়ায় উঠে আসতে অনায়াসে সাহায্য করতে পারতাম। বছর তিনেক আগে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায়। মানুষের জীবনে অতবড় দুর্ঘটনা কখনও ঘটে না, ঘটে থাকলে তার বর্ণনা দেবার জন্যে সে বেঁচে থাকেনা। ঘণ্টা ছয় ধরে যে ভয়ঙ্কর পরিবেশের সঙ্গে আমাকে লড়াই করতে হয়েছিল তাতেই আমার দেহমন পুরো ভেঙে পড়েছে। আমাকে যতটা বৃদ্ধ মনে হচ্ছে আসলে আমি ততটা বৃদ্ধ নই। পুরো চব্বিশ ঘণ্টাও লাগেনি তারও আগে আমার ঘন কালো চুল সাদা হয়ে গেল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয়ে গেল শিথিল আর স্নায়ুর দৌর্বল্য আমাকে পুরো পেড়ে ফেলল। আজ আমি অল্প পরিশ্রমে ভেঙে পড়ি, ছায়া দেখলেও শঙ্কিত হই। এখান থেকে তলার দিকে তাকালে আজ আমার মাথা ঘুরে যায়, এ তুমি বিশ্বাস করতে পার?'

পাহাড়ের যে ছোট্ট চুড়োটার ওপর তিনি অত্যন্ত অসাবধানে নিজের ভারি শরীরটাকে বিশ্রামের জন্য টেনে এনে ফেলেছিলেন, সেটার ওপর তাঁর শরীরখানা আলতোভাবে ঝুলে ছিল। কনুই দিয়ে পিছল চুড়ো থেকে পতনের সম্ভাবনাটাকে তিনি কোনরকমে রোধ করছিলেন। যেটাকে আমি ছোট চুড়ো বলছি সেটা ছিল একটা কালো চকচকে গিরিচূড়া। উচ্চতায় পনেরো থেকে ষোল শ' ফুট। এই চূড়োটা অনেকগুলো চূড়োর রাজ্যে বেশ খানিকটা

মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। আমরা যেখানে বসেছিলাম সেখান-থেকে গজ ছয়েক দূরে সমতল অংশটা ফুরিয়ে গিয়েছিল। আমার সঙ্গী যে বিপজ্জনক অবস্থায় বসেছিলেন সেইটের দিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। এই উত্তেজনার ফলে আকস্মিকভাবেই আমি পিছলে পড়লাম, আর বহু কষ্টে পাশের ঝোপঝাড়গুলোকে আঁকড়ে ধরে একেবারে নীচে গড়িয়ে পড়ার থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখলাম। উঁচুতে আকাশের দিকে তাকানোর মত সাহস তখন আর আমার ছিলনা। মনে হচ্ছিল বাতাসের প্রচণ্ড বেগে পাহাড়ের ভিতটাই কেঁপে উঠছে যেন। একটু পরে দুর্বলতা কাটিয়ে আর সাহস সঞ্চয় করে আমি উঠে বসলাম আর দূরের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম।

আমার পথপ্রদর্শক বললেন, 'তোমার ওই অলস কল্পনাগুলোকে জয় করা উচিত। ঘটনাটা যেখানে ঘটেছিল সেই জায়গাটা যাতে তুমি পুরোপুরি দেখতে পাও সেজন্যেই তোমাকে আমি এখানে এনেছি। তুমি জায়গাটি দেখবে আর সেই সঙ্গে তোমাকে আমি কাহিনীটি শোনাব।'

যে বিশিষ্ট ভঙ্গীতে কথা বলার জন্য তিনি অন্যান্যদের থেকে পৃথক, সেই বিশেষ ভঙ্গীতেই তিনি বলে উঠলেন, 'নরওয়ের যে এলাকা অক্ষাংশ থেকে আটষট্টি ডিগ্রী দূরে, বিখ্যাত সেই নর্ডল্যাণ্ড এলাকার নির্জন নিরানন্দ অঞ্চল লফোডেনে এসেছি আমরা। মেঘাচ্ছন্ন যে পর্বতচূড়ায় আমরা বসে আছি সেটার নাম হেলসেগ্‌গেন। যদি নীচের দিকে তাকাতে তোমার ভয় করে বা মাথা ঘোরে তাহলে ঘাসগুলো ধরে তুমি একটু মাথা তুলে দেখ, তোমার সামনেই কুয়াশা ঘেরা সমুদ্র।

আমার মাথা ঝিম্ ঝিম করছিল। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সমুদ্রের বিশাল বিস্তার। ঘন কালির মত এই দৃশ্য দেখে নুবিয়ানের ভূগোলে যে অন্ধকারাচ্ছন্ন সমুদ্রের বর্ণনা আছে সেইটে হঠাৎ আমার মনে পড়ল। এর চাইতে নিরানন্দকর আর শোচনীয়-

ভাবে নির্জন দৃশ্য মানুষ কোনদিনই কল্পনা করতে পারবে না। ডাইনে বাঁয়ে যেদিকেই চোখ ফেরাই সেদিকেই দেখি অসীম বিস্তৃত সমুদ্র। পৃথিবীর চারদিকে প্রাচীরের মত কালো ভয়ঙ্কর বড় বড় পাহাড় দাঁড়িয়েছিল আর তারই পটভূমিতে বিষাদময় চিত্র এঁকে চলেছিল সমুদ্রতরঙ্গের ওপরে জেগে থাকা সাদা রঙের ফেনা। তার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল সমুদ্রের অবিরাম তীক্ষ্ণ উন্মাদ আর্তনাদ। আমাদের পর্বতচূড়াটা থেকে পাঁচ ছ' মাইল দূরে সমুদ্রের বুকে ছোট কালো ফোঁটার মত একটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছিল। ওটার চারদিকে তরঙ্গের প্রচণ্ড বিক্ষোভই ওটাকে ভালো করে চিনিয়ে দিচ্ছিল। সমুদ্রের তীর থেকে মাইল দুয়েকের মধ্যেও একটা আরও ছোট আর অজস্র পাহাড়ে পরিপূর্ণ নিষ্প্রাণ দ্বীপ ছিল। ওটার বুকের ওপর একটুখানি অন্তর বেশ কয়েকটা করে কালো রঙের পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল।

দূরের দ্বীপ আর তীরভূমির মধ্যেকার সমুদ্রকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত বলে মনে হচ্ছিল। আমরা যখন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিলাম তার কিছুক্ষণ আগে থেকে তীরের দিকে প্রবল ঝড় বয়ে আসছিল। দূরে দেখা যাচ্ছিল দু'পালওয়ালা একটা জাহাজকে। উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে ওটার অধিকাংশ দেহটাই চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছিল মধ্যে মধ্যে। সমুদ্রে যে প্রচণ্ড জোয়ার এসেছিল তা নয়, তবু তার ছোট ছোট ঢেউগুলো বাতাসের আঘাতে এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছিল আর যেখানে যা পাচ্ছিল তারই ওপর আছড়ে পড়ছিল। পাশের পাহাড়গুলোর ওপর ছাড়া ফেনা কিন্তু দেখা যাচ্ছিল না।

বৃদ্ধ তাঁর বক্তব্য আবার শুরু করলেন, 'দূরের দ্বীপটাকে নরওয়ের লোকেরা ভার্গ বলে। মাঝখানেরটাকে বলে মস্কো। উত্তর দিকে মাইল খানেক দূরে আছে আম্বারেণ। আরো দূরে ওদিকে আছে ইফেসেন, হোইহোমু, কিয়েল্ডহোম, সোয়ারভেন আর বাক্‌হোম। আরও বেশ দূরে মস্কো আর ভার্গের মধ্যে আছে অটার হোম,

ক্লিমেন, স্থাগু ক্লেসেন আর স্কারহোম। এ সবই ওই দ্বীপগুলোরই নাম কিন্তু ওগুলোর নামকরণের প্রয়োজনীয়তা কী ছিল তা তুমি বা আমি কেউই বুঝতে পারবোনা। কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছ তুমি? সমুদ্রের কোন পরিবর্তন কি চোখে পড়ছে?'

মিনিট দশেক হল আমরা হেলসেগ্‌গেনের চূড়ায় এসে বসেছি। আসবার সময় আমরা লোফোডেনের ভেতরদিক দিয়ে উঠে এসেছি বলে সমুদ্র আমাদের মোটেই চোখে পড়েনি। এখন পাহাড়ের চূড়া থেকে পুরো সমুদ্রটা আমাদের চোখে পড়ছে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলার পর একটা ক্রমবর্ধমান তীব্র শব্দ সম্পর্কে আমি ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠতে লাগলাম। আমেরিকার কোন এক তৃণাচ্ছন্ন প্রান্তরের মধ্যে একপাল মহিষের চীৎকারের সঙ্গেই শুধু তার তুলনা চলে। নাবিকেরা সমুদ্রের যে চরিত্রকে ধ্বংসশীল বলে বর্ণনা করে সেই চরিত্র আমি পালটে যেতে দেখলাম। মনে হল ঢেউয়ের উত্তালতা থেমে গিয়ে দ্রুতগতিতে একটা বিরাট স্রোতোধারা পূর্বমুখী হয়ে ছুটে চলেছে। দেখতে দেখতে তার গতি অকল্পনীয় প্রচণ্ডতা লাভ করে প্রতিমুহূর্তে ভীষণ থেকে ভীষণতর হয়ে উঠতে লাগল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ভার্গ পর্যন্ত পুরো সমুদ্রটা অশান্ত উন্মত্ততায় বীভৎস হয়ে উঠল। অবশ্য এই বীভৎসরূপের চরম প্রকাশ ঘটল মস্কো আর তীরভূমির মধ্যে। এদের ভেতরকার সমুদ্র হঠাৎ প্রবল স্রোতে ছুটে চলল পূর্বমুখী হয়ে আর তার সেই উন্মত্ত দ্রুতগামিতার সঙ্গে গর্জন আর উচ্ছ্বাস মিশে গিয়ে যে ভীষণরূপ ধারণ করল, সাধারণত ঘূর্ণাবর্ত ছাড়া অন্য কোথাও ওরকমের ভয়ঙ্কর রূপ দেখা যায় না।

পরের কয়েক মিনিটের মধ্যে দৃশ্যটার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেল। জলের ওপর যে আলোড়ন দেখা যাচ্ছিল তা অনেকখানি থেমে গেল আর তার পরিবর্তে মাঝে মাঝে অনেকখানি করে ফেনা জমে উঠল। পরমুহূর্তে সেই ফেনপুঞ্জগুলি অনেকদূর ছড়িয়ে পড়ে একটি ঘূর্ণাবর্তের আকর্ষণে আবর্তিত হতে থাকল আর সৃষ্টি করল একটি বিশালতর ঘূর্ণাবর্তের। একটু পরেই হঠাৎ স্পষ্টতর হয়ে

উঠল প্রায় আধ মাইলের বেশী: ব্যাসের একটা বিরাট আবর্ত। এই ঘুর্ণাবর্তের মাঝখানটা গড়ে উঠেছিল ভয়ঙ্কর একটা ফানেলের মত আর এর প্রান্ত ভাগ বেশ চওড়া হয়ে জল ছড়াতে ছড়াতে ছুটে চলেছিল তীব্র বেগে। ভেতরের দিকে যতদূর দৃষ্টি চলে তাতে দেখা যাচ্ছিল কালো মসৃণ চকচকে জলরাশি, আনুমানিক পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী কোণ করে দিক্‌চক্রবালের দিকে বেঁকে উঠে গেছে আর প্রবল বেগে আবর্তিত হয়ে চলেছে। সেই আবর্তনের বিপুল আবেগে কিছুটা আর্তনাদের আর কিছুটা গর্জনের মত এমন একটা শব্দ সৃষ্টি হয়ে আকাশে উত্থিত হচ্ছিল যার কাছে নায়েগ্রা জলপ্রপাতের ধ্বনিও ম্লান হয়ে যায়।

পাহাড়টার ভিত্তিমূল কেঁপে উঠছিল আর দোল খাচ্ছিল তার উপরকার পাথরগুলো। প্রচণ্ড স্নায়বিক আলোড়নে আমি পাহাড়ের চূড়ায় শুয়ে পড়লাম আর কাছেই ছোটখাটো যে দু' একটা ঝোপ ছিল সেগুলোকে আঁকড়ে ধরে নিজেকে ভয়ের হাত থেকে মুক্ত করতে চাইলাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে একটু সামলে নিয়ে বৃদ্ধকে লক্ষ্য করে আমি বলে উঠলাম, 'এ সেই উপকূলবর্তী বিখ্যাত জলাবর্ত ছাড়া আর কিছু নয়।'

—হ্যাঁ একে তাই বলে বটে। মস্কো দ্বীপ আর উপকূলের মাঝখানে এর উৎপত্তি বলে আমরা নরওয়ের অধিবাসীরা একে মস্কো-আবর্ত বলি।

আগে এই ঘুর্ণাবর্ত সম্পর্কে কিছু জানলেও আজকের এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার জন্যে আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। জোনাস্ রেমাসের বর্ণনা যতই নিখুঁত হোক না কেন আজকের এই দৃশ্যের বিরাটত্ব বা ভয়াবহতার ক্ষীণতম ধারণাও তা আমাদের দিতে পারেনা। এই দৃশ্যের অভিনবত্ব আর হিংস্রতা মানুষকে সম্পূর্ণরূপেই বিভ্রান্ত করে ফেলে। আমি জানিনে লেখক কোথা থেকে আর কোন সময় এই ঘুর্ণাবর্তের দৃশ্য দেখেছিলেন। তবে এ কথা নিশ্চয়ই যে ঝড়ের সময় হেলসেগগেনের চূড়ো থেকে তাকে তিনি দেখেননি। তাঁর বর্ণনা

থেকে কয়েকটা অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করে এর খুঁটিনাটি দিকগুলো বোঝানোর চেষ্টা করা যায় ঠিকই, তবু এই দৃশ্যের প্রকৃত স্বরূপটিকে পাঠকের উপলব্ধির মধ্যে পৌঁছে দেওয়া কখনোই সম্ভব হবে না।

তিনি বলেছেন, 'লোফোডেন আর মস্কোর মধ্যবর্তী অংশে সমুদ্রের গভীরতা দু'শ থেকে আড়াইশ' ফুটের মত। ভার্গের দিকে গভীরতা ক্রমশ কমে এসেছে। সে দিকটায় জাহাজ যাতায়াতের পক্ষেও যথেষ্ট গভীরতা নেই। খুব শান্ত আবহাওয়ার মধ্যেও ওদিকটায় পাহাড়ে ধাক্কা খাবার ভয় থাকে জাহাজগুলোর। বন্যার সময় লোফোডেন আর মস্কোর মধ্যে জল বেড়ে দ্বীপগুলোর অনেক-খানি অংশ ডুবিয়ে ফেলে। কিন্তু ভাঁটার সময় যে প্রচণ্ড গর্জনে জল ছুটে যায় তার সঙ্গে জলপ্রপাতের প্রবল গর্জনেরও তুলনা হয় না। সে গর্জন শোনা যায় বহু দূর থেকেই। এই সময় যে ভয়ানক ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হয় তার মধ্যে দুর্ভাগ্যক্রমে কোন জাহাজও যদি গিয়ে পড়ে, সেটা অবলীলায় জলের তলায় তলিয়ে যায়। ঘূর্ণির আবর্তে পড়ে সেটি ডুবন্ত পাহাড়ের ওপর আছাড় খায়, আর চূরমার হয়ে যায়। ঘূর্ণির এই উদ্দামতা যখন শান্ত হয়ে আসে তখন জাহাজের এই ভাঙা টুকরোগুলো ভেসে ওঠে। কিছু কিছু এসে তটভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে। এই অঞ্চলের সমুদ্রের শান্ত অবস্থাটি শুধু জোয়ার আর ভাটার মাঝখানে মাত্র দেখতে পাওয়া যায়। সেটি তাই স্থায়ী হয় প্রায় মিনিট পনেরোর মত। তার পরেই তার তীব্রতা ফিরে আসতে শুরু করে। এর পর যখন তার মত্ততা প্রবল হয়ে ওঠে তখন যদি ঝড়ো হাওয়া বইতে থাকে তা হলে ওর কয়েক মাইল দূরত্বের মধ্যেও তখন আসা নিরাপদ নয়। এর থেকে নিরাপদ দূরত্বে না-থাকার দরুণ বহু নৌকো, বোট, জাহাজ এর কবলে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। বড় বড় তিমিগুলোও এর আওতার মধ্যে এসে কাবু হয়ে পড়েছে। তখন তাদের বেঁচে থাকবার জন্যে যে কি প্রাণান্তকর ব্যর্থ চেষ্টা। একবার লোফোডেন থেকে একটা ভালুক সাঁতরে আসছিল মস্কো দ্বীপটার দিকে। বেচারা গিয়ে পড়ে ঘূর্ণির মধ্যে আর তলিয়ে যায়। তখন

তার আর্ত চীৎকার উপকুল অঞ্চলে স্পষ্ট শোনা গিয়েছিল। পাইন আর ফার গাছ প্রচুর সংখ্যায় এই ঘুর্ণির মধ্যে গিয়ে পড়ে। স্রোতের ভয়ঙ্কর আবর্তে সেগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে যখন্ন ভেসে ওঠে তখন জলের ওপরটা ওদের টুকরোতে ভর্তি হয়ে থাকে। এ থেকে অনুমান করে নেওয়া সহজ যে এই অঞ্চলে জলের তলায় অজস্র পাহাড় আছে। আবর্তের মধ্যে যা কিছু পড়ে ডুবে যায়, সেগুলো গিয়ে এদিকে ওদিকে ওদের গায়ে ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়। এই অঞ্চলে প্রতি ছ' ঘণ্টা অন্তর জোয়ার ভাটা। ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দের এক উৎসবের দিনে রোববারে এই ঘুর্ণির প্রচণ্ডতা আর গর্জন এমন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছিল যে উপকুলের কয়েকটা বাড়ীঘরের দেয়ালই ভেঙে পড়েছিল।'

ঘুর্ণির খুব কাছাকাছি এলাকার গভীরতা কী ভাবে স্থিরীকৃত হয়েছিল জানিনে। 'দু'শ থেকে আড়াই'শ ফুট' বলে গভীরতার যে পরিমাণ উল্লিখিত হয়েছে, তা লোফোডেন বা মস্কোর তীরভূমি বরাবর যে প্রণালীগুলো রয়েছে তারই গভীরতা হয়তো বা। মস্কো ঘুর্ণাবর্তের কেন্দ্র অঞ্চলের গভীরতা যে পরিমাপের বাইরে তাতে সন্দেহ কি! হেলসেগগেনের উচ্চতর চূড়ো থেকে ঘূর্ণির দিকে তাকিয়ে দেখেই যা বোঝা যায় তার চাইতে বেশী নির্ভরযোগ্য প্রমাণের প্রশ্ন এ ক্ষেত্রে ওঠে না। প্রকৃতপক্ষে এই চূড়া থেকে ঐ ভয়ঙ্কর ঘূর্ণাবর্তের দিকে তাকিয়ে জোনাস রেয়াসের সহজ সবল বর্ণনা আর তিমি-ভালুকের কাহিনী অবিশ্বাস্য এবং হাস্যকরই মনে হয়েছে। এ কথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা যে সমুদ্রগামী বৃহত্তর জাহাজও যদি এই ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে গিয়ে পড়ে, মুহূর্তের মধ্যে তা ঝড়ের মুখে পালকের মতো তলিয়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

এই বর্ণনা যখন অতীতে আমি পড়েছিলাম তখন অনেকখানি বিশ্বাসযোগ্যই মনে হয়েছিল, আজ চোখের সামনে ঐ দৃশ্য দেখে ঐ বর্ণনাকে নিতান্তই ভিন্ন আর অকিঞ্চিৎকর মনে হতে লাগল। এই বিশাল আবর্তটি আর ফেরো দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে যে আরো তিনটি

ছোট ছোট আবর্ত আছে সেগুলো সম্পর্কে সাধারণ অভিমত এই যে 'জোয়ার ভাটার সময় জলমগ্ন শৈলশ্রেণীর সঙ্গে উত্তাল তরঙ্গের যে সংঘর্ষ ঘটে তারই ফলে স্বাভাবিক ভাবে জলপ্রবাহের উচ্চাবচ অবস্থাটি এই ঘৃর্ণি সৃষ্টি করে। অস্বাভাবিক পরিমাণে বিশালকায় চোষণ ছাড়া এই ঘৃর্ণির অন্য কোন পরীক্ষিত কারণ নেই।' কথা-গুলো এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার। কিরচার এবং অন্যান্যেরা মনে করেন যে এই ঘুর্ণাবর্তের অতল গহ্বর পৃথিবীর অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত আর এই প্রসঙ্গে বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত বোথনিয়া উপসাগরের সঙ্গে এর সম্পর্কের কথা এক জায়গায় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিতও হয়েছে। এই সব মন্তব্য কতখানি সমর্থনযোগ্য সে সন্দেহ আমার চিরদিনই ছিল, তবু আজ পর্বতচূড়ার উচ্চতম স্থান থেকে ঘৃর্ণির দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল, ঐ ধারণা একান্ত সত্য। বৃদ্ধ ভদ্রলোককে জানালাম আমার তদানীন্তন মনের কথা। উনি সব শুনে যা বললেন তাতে আমি রীতিমতো বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। উনি বললেন, এই অভিমত নরওয়েবাসীরা প্রায় সকলেই স্বীকার করে নিলেও, উনি স্বয়ং এ সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেন। ঘৃর্ণির কারণ সম্বন্ধে যে ধারণা উল্লিখিত হয়েছে সে সম্পর্কেও তিনি যে আস্থাহীন তাও অকপটেই প্রকাশ করলেন।

'এখন তুমি ঘৃর্ণিটা আরও ভালোভাবেই দেখতে পাবে', বললেন বৃদ্ধ। 'আর যদি চূড়োটার ওদিকে ঘুরে গিয়ে এই প্রচণ্ড শব্দটাকে কিছু পরিমাণে আড়াল করতে পার তা হলে আমি তোমাকে একটা গল্প শোনাই। গল্পটা শুনলে তবে গিয়ে তুমি বিশ্বাস করবে যে এই ঘৃর্ণাবর্ত সম্পর্কে আমার সত্যিকারের কিছু অভিজ্ঞতা আছে।'

বাতাস যে দিক থেকে বইছিল আমরা সেই দিকে ঘুরে গেলাম আর উনি তাঁর কাহিনী শুরু করলেন।

'আমার আর আমার দু'ভায়ের একটা প্রায় সত্তর টন ওজনের মাল বওয়ার উপযোগী দু'পাল-ওয়ালা বড় নৌকো ছিল। ওটা নিয়ে আমরা মস্কো পেরিয়ে ভার্গের কাছাকাছি এলাকায় মাছ ধরতে

যেতাম। একটু সাহস নিয়ে ওদিকের উত্তাল সমুদ্রে যেতে পারলে মাছ পাওয়া যেত প্রচুর। লোফোডেন উপকূলভাগের যারা বাসিন্দা তাদের মধ্যে আমরাই শুধু প্রায় নিয়মিত ভাবেই ও এলাকায় যেতাম। মাছ পাওয়ার অঞ্চলটা ছিল বেশ খানিকটা দক্ষিণদিকে। খুব একটা বিপদের ঝুঁকি না নিয়ে ওখানে সারাদিন মাছ ধরা যেত। আমরা তাই ওই এলাকাটাকেই বেশী পছন্দ করতাম। ওখানকার পাহাড়গুলোর মধ্যে আমাদের একটা বেশ পছন্দসই জায়গা ছিল। মাছ ওখানে ধরা পড়ত প্রচুর। ওখানে একদিনে আমরা খুব ভালো জাতের মাছ যে পরিমাণে পেতাম, অন্য জায়গায় এক সপ্তাহেও তা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। পরিশ্রমের কথা ছেড়ে দিয়েও বলা যায় যে মরণ-বাঁচনের প্রশ্ন থাকলেও ওখানে মাছ ধরতে যাওয়াটা আমাদের প্রায় নেশায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আমাদের সাহসিকতার জন্য পুরস্কারও পেতাম প্রচুর।

'শান্ত আবহাওয়ার সময় ওখানকার উপকূল থেকে প্রায় মাইল পাঁচেক দূরে ছোট্ট খাঁড়ির ভেতর নৌকোটাকে নিয়ে গিয়ে জোয়ার আর ভাটার মধ্যে যে মিনিট পনেরো সময় সমুদ্র শান্ত থাকে তারই মধ্যে মস্কো ঘূর্ণির কাছ বরাবর গিয়ে পড়তাম, আর অটার হোম বা স্যাণ্ডফ্লেসেনের কাছে নোঙর নামিয়ে দিতাম। ওখানকার ঘূর্ণিজল অন্য জায়গার মতো বেশী ভয়ঙ্কর মনে হোতো না। ঘূর্ণি থেমে যাওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করতাম, তারপর রওনা হতাম বাড়ীর দিকে। আমরা প্রত্যেকবারেই বাতাসের সুযোগ নিতাম। আর এই বাতাসের সুযোগ প্রতিবারই এমন সুন্দর ভাবে গ্রহণ করতাম যে যাওয়া আসার পথে কোনদিনই কোন অসুবিধে আমাদের হয়নি। গত ছ' বছরের মধ্যে বাতাসহীন থমথমে আবহাওয়ার দরুণ আমাদের দু'রাত ও এলাকায় কাটাতে হয়েছিল। আর একবার এমন অদ্ভুত ঝড়ের মধ্যে পড়েছিলাম যে প্রায় অনাহারে সপ্তাহখানেক আমাদের বন্দী হয়ে থাকতে হয়েছিল ওই এলাকায়। ঝড় আমাদের টেনে নিয়ে গিয়েছিল ঘূর্ণির দিকে আর তার পরিবর্তনশীল স্রোতের

মধ্যে পড়ে একদিন দু'দিন করে এখানে ওখানে আমরা নিরুপায় অবস্থায় ভেসে চলেছিলাম। নোঙর ফেলেও তা থেকে আমরা রক্ষা পাইনি। শেষ পর্যন্ত সৌভাগ্যক্রমে ঐ স্রোতেরই বেগ ফ্লিমেনের একটা খাঁড়ির মধ্যে আমাদের নিয়ে ফেলে আর আমরা সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে যাই।

'ওখানে সে সময় আমরা ঠিক কতখানি বিপন্ন হয়েছিলাম, তার বিশভাগের একভাগও আমি বর্ণনা করতে পারলাম না। ভাল আবহাওয়াতেও ও জায়গাটা খুব নিরাপদ ছিল না। আমরা কিন্তু ঐ মস্কো-ঘূর্ণির কাছাকাছি প্রায়ই যেতাম আর কোন দুর্ঘটনার মুখো-মুখী না হয়েই প্রত্যেকবার ফিরে আসতাম। দু'একবার অবশ্য ঠিক সময়ের এক মিনিট আগে বা পরে ঘুর্ণির কাছে গিয়ে পড়ার দরুণ আমাদের প্রাণ বেরিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। বাতাস ঠিক যত জোরে বইবে বলে হিসেব করে বেরিয়েছি, শেষ পর্যন্ত তার সে গতিবেগ কমে গেছে, আর আমরা পৌঁছতে দেরী করে ফেলেছি। ইতিমধ্যে স্রোত ভয়াবহ হয়ে উঠেছে আর আমাদের নৌকোটা তার মধ্যে পড়ে বিপন্ন হয়েছে। আমার বড় ভায়ের ছিল এক ছেলে। তার বয়স হয়েছিল আঠারো বছর। আমার ছিল দুটি খুব স্বাস্থ্যবান ছেলে। এরা নৌকো আটকাতে আর মাছ ধরতে অনেক সাহায্য করত আমাদের। যাই বলিনা কেন সমুদ্রে কিছু বিপদের ঝুঁকি তো ছিলই, তাই ছেলেদের নিয়ে যেতে আমাদের মন চাইত না। বিপদ বিপদই আর তা মিথ্যে নয় মোটেই।

'যে ঘটনার কথা বলতে যাচ্ছি তোমাকে, সেটি ঘটেছিল বছর তিনেক আগে। ১৮—সালের দশই জুলাইয়ের ঘটনা। সে দিনের কথা পৃথিবীর এই অংশের মানুষ কোনো দিনই ভুলবে না, ভোলা সম্ভবও নয়। এতবড় ভয়ঙ্কর ঝড় এর আগে কোন দিনই উর্ধ্বলোক থেকে এই অঞ্চলের ওপর নেমে আসেনি। তবু কিন্তু সকালের দিকটা, এমন কি বলা যায় সন্ধ্যে পর্যন্ত আবহাওয়া প্রায় শান্তই ছিল, আর দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে সুন্দর বাতাস একটানা বয়ে চলেছিল।

আকাশে সূর্য রোজকার মতোই উজ্জ্বল ছিল আর আমাদের মত অভিজ্ঞ সমুদ্রযাত্রীরাও কল্পনা করতে পারেনি যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একটা বিপর্যয় ঘটে যেতে চলেছে।

'বিকেল দু'টো নাগাদ আমার দু'ভাই আর আমি, আমরা তিনজন ওদিকের দ্বীপটার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁচেছিলাম, পথে আমরা ভালো জাতের এত মাছ পেয়েছিলাম যে ওরকম মাছ আগে কোনদিন ধরেছি বলে মনেই পড়ে না। ভাটা শুরু হলে আটটা নাগাদ সন্ধ্যের দিকে ঘুর্ণি আরম্ভ হয়, তাই আমার ঘড়িতে যখন সাতটা তখন আমরা বাড়ীর দিকে রওনা দিয়েছিলাম। পালে চমৎকার হাওয়া পেয়েছিলাম তাই নৌকোও চলেছিল বেশ বেগে। বিপদের ক্ষীণতম সম্ভাবনাও আমরা কেউ কল্পনা করিনি। হঠাৎ হেলসেগ্‌গেনের দিক থেকে হাওয়া বইতে শুরু করল। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। ঠিক কী ঘটতে যাচ্ছে না বুঝলেও বড় অস্বস্তি বোধ করলাম। বাতাসটার সাহায্য যতটুকু পারি নিয়ে এগোবার হাজার চেষ্টা করেও আমরা এগোতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত মনে হোল আমরা যেখানটায় নোঙর করে থাকি সেখানে ফিরে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। হঠাৎ আকাশের দিকে চোখ পড়ল আমাদের। সারা আকাশ জুড়ে তখন তামাটে রঙের মেঘ হুহু করে উঠে আসছিল।

'হঠাৎ এক সময় বাতাস স্তব্ধ হয়ে গেল। আমরাও নির্দিষ্ট গতি হারিয়ে সমুদ্রের বুকে এদিক ওদিক ভেসে বেড়াতে লাগলাম। কিন্তু আমরা কোন অবস্থার মুখোমুখী হচ্ছি সে কথা ভাববার মত অবসরই পেলাম না। মিনিট খানেকের মধ্যেই ঝড় এসে পড়ল আর মিনিট দুয়েকের মধ্যে এমন ঘন কালো অন্ধকার নেমে এলো যে নৌকোর ভেতর আমরা পরস্পরের মুখও দেখতে পাচ্ছিলাম না।

'সে ঝড়ের বর্ণনা দেবার শক্তি আমার নেই। নরওয়ের সবচেয়ে বৃদ্ধ নাবিকও নাকি এ ধরণের ঝড় দেখেননি জীবনে। আমাদের পালগুলো নামিয়ে ফেলার আগেই ঝড়ের প্রথম ধাক্কায় মাস্তুলগুলো

এমনভাবে ভেঙে পড়ল যেন কেউ করাত দিয়ে ওগুলোকে কেটে ফেলেছে। ছোট ভাই বড় মাস্তুলটা আঁকড়ে ঝড় থেকে বাঁচতে চাইছিল। মাস্তুলের সঙ্গে সে সমুদ্রে ছিটকে পড়ল।

'আমাদের নৌকোটা ছিল খুব হালকা। ওটা প্রায় পালকের মত জলের ওপর ভাসছিল। ওটার ওপর একটা পাটাতন ছিল আর ছিল তার মাথার দিকটায় একটুখানি ফাঁকা জায়গা। ঝড়ের মুখে পড়লে আমরা ঢেউয়ের আঘাত থেকে বাঁচবার জন্যে ওটা বন্ধই করে দিতাম। আমরা কিন্তু তখন এরকম একটা অবস্থার মধ্যে ছিলাম যে কোন কিছু করাই সম্ভব হচ্ছিল না। আমার বড় ভাই কী করে বেঁচে ছিলেন জানিনা, সে খোঁজ নেবার সুযোগই হয়নি আমার। পাল সহ মাস্তুল ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি পাটাতনের ওপর শুয়ে পড়েছিলাম আর সামনের মাস্তুলটার তলায় একটা লোহার আংটা ধরে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছিলাম। সহজাত প্রবৃত্তির বশেই আমি ওভাবে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু এ কথাও ঠিক যে ওই পদ্ধতিটা খুবই নির্ভরযোগ্য ছিল।

'আমরা তখন পুরোপুরি জলের তলায়। প্রাণপণে দম আটকে রেখে লোহার আংটাটি আঁকড়ে ধরেছি আমি। ব্যাপারটা যখন অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো তখন আমি ঐ অবস্থায় হাঁটুতে ভর দিয়ে মাথাটা তুলে দম নিতে চাইলাম। জল থেকে উঠে আসার সময় কুকুরগুলো যেভাবে শরীরটাকে নাড়া দেয়, আমাদের নৌকোটায় সেই রকম একটা প্রবল ঝাঁকি লাগল। আমার তখন কেমন যেন আচ্ছন্ন অবস্থা। তবু প্রাণপণ শক্তিতে ইন্দ্রিয়গুলোকে সজাগ রেখে অবস্থাটা বোঝবার চেষ্টা করছি আমি। হঠাৎ মনে হোল কে যেন আমার হাত ধরেছে। ভীষণ আনন্দ হোল আমার। আমি জানতাম আমার দাদা তখনো নৌকোয় আছেন। কিন্তু এ আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হোল না। দাদা কানের কাছে মুখ এনে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মস্কো-আবর্ত'।

'সেই মুহূর্তে আমার মানসিক অবস্থা কেমন হয়েছিল সে খবর

আজ আর কারোর জানার কথা নয়। একটা দুঃসহ যন্ত্রণায় আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত থর থর করে কেঁপে উঠল। ঐ একটি শব্দ উচ্চারণ করে দাদা ঠিক কী বোঝাতে চাইছিলেন, মুহূর্তের মধ্যেই তা বুঝতে পেরেছিলাম আমি। বাতাসের পরিবর্তিত গতি তখন আমাদের টেনে নিয়ে চলেছিল সেই ঘূর্ণাবর্তেরই দিকে। কারোর শক্তি ছিল না যে আমাদের বাঁচায়।

'তোমাকে বলেছি যে ঘূর্ণির এলাকা ছাড়িয়ে আমরা সাধারণত বেশ খানিকটা উজানে চলে গিয়ে ভাটার জন্যে অপেক্ষা করতাম। আবহাওয়া যখন শান্ত থাকত, আমাদের কাজের ধরণই ছিল ঐ রকম। এখন কিন্তু প্রচণ্ড ঝড়ের ধাক্কায় আমরা সোজাসুজি ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে চলে যাচ্ছিলাম। একবার মনে হোল ভাটার টান শুরু হতে এখনো দেরী আছে। এই মুহূর্তে নিরাশ হবার মত কিছুই নেই। পরমুহূর্তে মনে হোল, আমি মূর্খের মতই আশা করছি। আমাদের সব শেষ হয়ে যেতে চলেছে, বিশাল আকৃতির যুদ্ধ জাহাজ থাকলেও এই মুহূর্তে রক্ষা পাওয়ার প্রশ্ন উঠত না।

'মনে হোল ঝড়ের বেগ একটু কমেছে। হয়ত বা ঝড়ের আঘাতে অনুভূতি আর বিচারবুদ্ধিই লোপ পেয়ে গিয়েছিল। তবে সমুদ্রের চেহারা যে বদলে গিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। অনেকখানি শান্ত আর ফেনবহুল সমুদ্র যেন বিরাট পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে উঠছিল। পরিবর্তন এসেছিল ওপরের আকাশেও। সেখানে ঘন কালো মেঘের মাঝখানে ছোট্ট একটা গোলাকার জায়গা থেকে মেঘ সরে গিয়ে গাঢ় নীলাকাশ আর পূর্ণিমার উজ্জ্বল চাঁদ বেরিয়ে পড়ল। চাঁদের এত আলো আমি বোধ হয় এর আগে কোন দিনই দেখিনি। চার-পাশের সব কিছুই সেই আলোর স্পর্শে স্পষ্টতর হয়ে উঠল আর ভগবানই জানেন কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য আমার চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হোল!

'দাদাকে দু'একটা কী যেন কথা বলতে ইচ্ছে হোল, বললামও কিছু দু'একবার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রচণ্ড গর্জনের মধ্যে সে কথা

কোথায় ডুবে গেল। আমি অবশ্য ওঁর কানের কাছেই প্রাণপণে চেঁচাচ্ছিলাম। দেখলাম মৃত ব্যক্তির মত দাদার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। একটা আঙুল উঁচিয়ে উনি চীৎকার করে উঠলেন, 'শুনছ?'

'প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারিনি কোনটা শোনার কথা উনি বলছেন, পরমুহূর্তেই কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর চিন্তায় আমি যেন আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। পকেট থেকে ঘড়িটা টেনে বার করে এনে সময়টা দেখতে চাইলাম। হায় ভগবান! ঘড়িটা সেই সাতটার সময় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভাটার সময়ের অনেক পরে আমরা এখানে এসে পড়েছি, আর ঘূর্ণাবর্ত তার সমস্তটুকু প্রচণ্ডতা নিয়ে আমাদের আকর্ষণ করছে। কেঁদে উঠে আমি ঘড়িটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম জলে।

'নৌকো যদি পাকাপোক্ত করে বানানো হয় আর বেশী বোঝা চাপানো না থাকে তাহলে প্রবল ঝড়ের সময়ও সমুদ্রের ঢেউগুলো তার তলা দিয়ে পিছলে যায়। ডাঙার মানুষদের কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকবে হয়ত কিন্তু নাবিকদের ভাষায় একেই 'রাইডিং' বা ঢেউতে দোল খাওয়া বলে।

'এতক্ষণ আমরা ঢেউয়ের মাথায় মাথায় দোল খেয়ে চলেছিলাম। বড় একটা অসুবিধে হয়নি, হঠাৎ এক সময় নৌকোটা যেন ঢেউয়ের মাথায় চেপে শূন্যে আকাশের দিকে উঠে গেল। সে উচ্চতা আমার কাছে অকল্পনীয় ছিল। ঠিক পর মুহূর্তেই আমরা যেন পিছলে নেমে চললাম অত্যন্ত দ্রুতবেগে বিরাট একটা গহ্বরের মধ্যে। স্বপ্নে উঁচু পাহাড় থেকে তলায় পড়বার সময় যেমন হয় আমার তেমন মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছিল। কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম দেহে মনে। নৌকোটা যখন উঁচুতে ছিল তখনই আমি এক পলক দেখে নিয়েছিলাম পুরো অবস্থাটা। আর তাতেই পরিস্থিতির গুরুত্ব আমি পরিষ্কার ভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। মস্কো আবর্ত থেকে আমরা তখন বড় জোর সিকিমাইল দূরে। সাধারণ আবর্ত সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা কম ছিল না। কিন্তু এটা যে তা ছিল

না তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। সে একটা অভূতপূর্ব আবর্ত। তার সর্বধ্বংসী স্বরূপ মানুষের স্বপ্নেরও অগোচর। আমরা কোথায় আর কীইবা আমাদের ভাগ্যে ঘটতে চলেছে, সব কিছু যেন আমি স্পষ্টই ভেবে নিতে পারছিলাম। ভীতির অস্বাভাবিক প্রচণ্ডতায় অনিচ্ছাকৃতভাবে আমার চোখগুলো বন্ধ হয়ে এলো। দৈহিক আক্ষেপের সময় যেমন হয়, অনেকটা প্রায় সেইরকম, আমার চোখের পাতাগুলো ভারী হয়ে চেপে বসে গেল।

'মিনিট দুয়েকের মধ্যেই ঢেউ শান্ত হয়ে এলো আর পুরো এলাকাটা ফেনায় ভরে গেল। আমাদের নৌকোটা হঠাৎ বাঁদিকে মোড় নিয়ে ভিন্ন একটা দিকে বিদ্যুতের মত ছুটে চলল। তীব্র আর তীক্ষ্ণ প্রচণ্ড একটা শব্দের মধ্যে সমুদ্রের গর্জন তলিয়ে গেল। ওরকম শব্দের কোন তুলনা নেই। হাজার হাজার জাহাজ যদি একই মুহূর্তে তাদের জলের পাইপগুলো খুলে দেয় আর সেই সঙ্গে ছেড়ে দেয় জমে ওঠা বাষ্প, তাহলে যে ধরণের শব্দ হতে পারে সেইটে ভেবে নাও। ঘূর্ণাবর্তের চারদিকে যে ডুবো পাহাড়ের অঞ্চল আমরা তখন সেইখানে। যে অবিশ্বাস্য গতিতে আমাদের নৌকো ছুটে চলেছে তাতে আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে যে আমরা আবর্তের তলায় তলিয়ে যাব, তা বুঝতে আর কোন অসুবিধেই ছিল না। নৌকোটা না ডুবে জলের ওপর বুদ্বুদের মত উঁচু ঢেউয়ের ওপর ভেসে চলেছিল। নৌকোটার সবদিকেই ছিল সেই ভয়ঙ্কর ঘূর্ণাবর্ত, তার বিরাট আকৃতির আড়ালে দিক্‌চক্রবালও হারিয়ে গিয়েছিল।

'অসম্ভব মনে হলেও কথাটা ঠিক যে ঐ বিরাট আবর্তের মুখোমুখি এসেও আমি অনেকখানি মানসিক স্থৈর্য বজায় রাখতে পেরেছিলাম। যে ভীতি আমার বিচারবুদ্ধিকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, মৃত্যু অবধারিত জেনেও তার বোঝা যেন মনের ওপর থেকে নেবে গেল। হতে পারে যে চূড়ান্ত হতাশাই আমাকে কিছুটা মনোবল ফিরিয়ে দিয়েছিল।

'অহঙ্কার নয়, সত্যিই মনে হোল যে এই বিরাট নৈসর্গিক ঘটনার মধ্যে মৃত্যুরও একটা গৌরব আছে। ঐশ্বরিক শক্তির এই অকল্পনীয় বিশালতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ক্ষুদ্র ব্যক্তিজীবনের নিরাপত্তা চিন্তা করাই মূর্খতা। হঠাৎ ঐ ঘুর্ণিটার সম্পর্কেই ভীষণ কৌতূহলী হয়ে উঠলাম আমি। চরম ত্যাগের মূল্যেও ওর তলদেশে পৌঁছে সব কিছু আবিষ্কার করার একটা বাসনা মনের মধ্যে আকস্মিকভাবে জেগে উঠল। দুঃখ হচ্ছিল একটা কারণেই—আমার এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্বরূপ কোনদিনই কাউকে বর্ণনা করে বোঝাতে পারব না। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এ ধরণের চিন্তা বোধহয় বাতুলেও করে না, তবু বারবার মনে হয় সেদিন আবর্তের চারদিকে নৌকোয় প্রদক্ষিণ করতে করতে আমি হালকা ভাবেই অনেক কিছু চিন্তা করতে পারছিলাম।

'বাতাস পুরো থেমে গিয়েছিল। তা ছাড়া ঘূর্ণাবর্তের ভেতরে যে গভীরতার সৃষ্টি হয়, সমুদ্রের অত নীচে বাতাস গিয়ে পৌঁছতেও পারে না। হয়তো এর জন্যেও আমার চিন্তার মধ্যে কিছুটা স্থৈর্য এসেছিল। আমাদের চারদিকে আবর্তের বহির্বৃত্তটি তখন কালো পাহাড়ের মত আকাশচুম্বী উচ্চতা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ঝড়ের সময় সমুদ্রের ভেতর ঢেউয়ের প্রচণ্ডতা আর ছড়িয়ে পড়া জলের অজস্রতা সাধারণ ভাবেই যে কোন মানুষকে বিহ্বল করে ফেলে। সে অবস্থা অনুমান করাও সম্ভব নয়। ওরকম অবস্থা মানুষকে শুধু অন্ধ আর বধিরই করে তা নয়, মানুষের সে অবস্থায় শ্বাসরোধ হয়ে আসে, কর্ম আর চিন্তাশক্তিও নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের কিন্তু তা হয়নি। হয়ত বা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামীদের যেভাবে সেলের মধ্যে ওদের খুশী-মতো যে কোন কাজই করতে দেওয়া হয়, অন্য বন্দীদের মতো বাধা নিষেধ আরোপিত হয় না, আমাদেরও সেই সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।

'আমরা আবর্তের মতো ক'টা পাক খাচ্ছিলাম তা মনে রাখা বা বলা সম্ভব ছিল না। ঠিক ভাসমান না বলে বরং বলা চলে উড়ন্ত অবস্থায় পাক খাচ্ছিলাম প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে। আর পাক খেতে

খেতে ঘূর্ণির ভীতিপ্রদ তলার দিকে নেবে চলেছিলাম। লোহার আংটাটা তখনো আমি ছেড়ে দিইনি। আমার দাদা ছিলেন নৌকোর পেছনের দিকে। উনি জলরাখা একটা মস্ত বড় খালি পিপে আঁকড়ে পড়ে ছিলেন। নৌকোর পাটাতনের ওপর আর কোন বস্তুই ছিল না। পিপেটা খুব শক্ত করেই পাটাতনের সঙ্গে বাঁধা ছিল। ঝড়ের প্রথম ধাক্কায় ঐ পিপেটা ছাড়া অন্য সব জিনিসই সমুদ্রে ভেসে গিয়েছিল। আমরা যখন আরও তলায় নেমে যাচ্ছি হঠাৎ দাদা পিপেটা ছেড়ে দিয়ে আমি যে রিংটা ধরে ছিলাম সেইটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আংটাটা খুবই ছোট ছিল। দু'জনের পক্ষে ওটা ধরা সম্ভব ছিল না। দাদা ভয়ের তাড়নায় আমার হাতটা খুলে দিয়ে নিজেই রিংটা ধরতে চাইলেন। ও অবস্থায় মানুষ সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে যায়। দাদার ব্যবহারে সেই রকম বিচারবুদ্ধিহীন উন্মত্ততাই প্রকাশ পাচ্ছিল। অস্বীকার করব না, দাদার ওরকম আচরণ দেখে সে মুহূর্তে আমি খুবই দুঃখ পেয়েছিলাম। আত্মরক্ষার ঐ অবলম্বনটুকু নিয়ে দাদার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামার কোন প্রশ্ন আমার দিক থেকে ছিলই না। মনে হচ্ছিল, আমাদের মধ্যে যে কেউ একজন ওটা ধরে বাঁচার চেষ্টা করুক, তাতে ক্ষতি কী? দাদাকে আংটাটা ছেড়ে দিয়ে আমি পিপেটার দিকে চলে গেলাম। আবর্তের প্রচণ্ড ঘূর্ণির মধ্যে নৌকোটা যেন উড়ে চলেছিল। মাঝে মাঝে ভীষণভাবে দোলা খেলেও পিপেটার দিকে চলে যেতে আমার খুব অসুবিধা হয়নি। ওখানে পৌঁছবার পরই হঠাৎ একটা প্রবল ঝাঁকুনি খেয়ে নৌকোটা ডানদিকে ঘুরে গেল আর তীব্র বেগে আবর্তের তলায় নেমে যেতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যেই মনে হোল, এবার সব শেষ! নীরবে আমি শেষবারের মত ঈশ্বরকে স্মরণ করলাম।

'পাতালে নেমে যাবার সেই সুতীব্র গতি সহ্য করতে পারছিলাম না। আমি চোখ বন্ধ করে প্রাণপণ শক্তিতে পিপেটা আঁকড়ে পড়ে থাকলাম। চোখ খুলে কোন কিছু দেখবার মত সাহস আমার ছিল না। মৃত্যু যে অনিবার্য তা জেনেছিলাম। কিন্তু তখনো জলের

তলায় গিয়ে পড়িনি আর মরণ-লড়াই শুরু হয়নি কেন সেইটেই বরং তখন আমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। বেশ কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল কিন্তু তখনও আমি জীবিত। আমরা যে কোথাও ভীষণ বেগে নেমে যাচ্ছি, এই অনুভূতিটা চলে গিয়েছিল। নৌকোটা এখন আড়াআড়ি ভাবে পাক খেয়ে চলেছিল। একটুখানি সাহস সঞ্চয় করে দৃশ্যটাকে আর একবার আমি দেখে নেবার চেষ্টা করলাম।

'আমার চারদিকের দৃশ্যাবলীকে কী পরিমাণ বিস্ময়, ভীতি আর শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে সেদিন দেখেছিলাম তা আমি জীবনে ভুলবো না। কালো রঙের একটা অবিশ্বাস্য আয়তনের ফানেলের মসৃন উজ্জ্বল ঘূর্ণায়মান দেহের মধ্যে আমরা দ্রুতবেগে পাক খাচ্ছিলাম। স্বল্পায়তন মেঘনির্মুক্ত আকাশ থেকে পূর্ণচাঁদের আলো ঝরে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল অতলস্পর্শী গহ্বরের তলদেশ পর্যন্ত কালো দেয়ালের ওপর সোনালী আলোর বন্যা বয়ে যাচ্ছে।

'সব কিছু খুঁটিয়ে দেখবার মত শক্তি বোধহয় আমার প্রথমটা ছিল না। তার জন্য দায়ী আমার তদানীন্তন বিভ্রান্ত অবস্থা। ভয়াবহ সৌন্দর্যের মহৎ প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই তখন চোখে পড়েনি। একটু সামলে নেবার পর আমার দৃষ্টি পড়ল নীচের দিকে। নৌকোটা জলের দেয়ালে প্রায় ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল, তাই নীচের দিকে তাকাতে আমার সামনে কোন বাধাই ছিলনা। প্রায় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রী কোনে নৌকোটা ঝুলছিল আর পাক খাচ্ছিল প্রচণ্ড বেগে। তাই পিপেটাকে আঁকড়ে ধরে থাকতেও ভীষণ অসুবিধে হচ্ছিল আমার।

'চাঁদ তার আলো পাঠিয়ে ঘুর্ণাবর্তের তলদেশ পর্যন্ত অনুসন্ধান করতে চাইছিল কিন্তু তা সম্ভব ছিল না। আমিও তলার দিকে একটা ঘন কুয়াশার আস্তরণের জন্যে কিছুই স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছিলাম না। এই কুয়াশা বা জলকণাবাহী বাতাস সম্পর্কে এইটুকুই বোধহয় বলা যায় যে ঘূর্ণাবর্তের প্রচণ্ড আঘাতে তার তলদেশেই এর সৃষ্টি হচ্ছিল। কিন্তু সেই গাঢ় কুয়াশার ভেতর থেকে

স্বর্গমুখী যে বিপুল আর্তনাদ উত্থিত হচ্ছিল তার কোন বর্ণনা দেবার চেষ্টাই আমি করব না।

'সমুদ্রের ফেনবহুল উপরিভাগ থেকে আবর্তের তলায় আমরা অনেকখানি দূরত্ব অতিক্রম করে এসেছি বটে, কিন্তু বাকী পথটুকু ঠিক ঐ হারে নামছিলাম না। দুলতে দুলতে, কাঁপতে কাঁপতে আমরা পাক খেয়ে তলায় নামছিলাম। এর ফলে কখনো চলেছিলাম কয়েকশ' ফুট কখনও বা পুরো আবর্তটাকেই একবার প্রদক্ষিণ করে আসছিলাম। এখনকার গতি তুলনামূলক ভাবে ছিল মন্থর কিন্তু প্রতিটি মুহূর্তকে অনুভব করতে পারছিলাম নিবিড় ভাবে।

'বিশাল পরিধির কালো জলাবর্তের মধ্যে যখন আমরা এইভাবে বাহিত হয়ে চলেছিলাম তখন আমার চারদিকে তাকিয়ে একসময় দেখলাম যে ঘূর্ণায়মান বস্তু শুধুমাত্র আমার নৌকোটাই নয়, ওপরে আর নীচে বহু ভাঙাচোরা বস্তুই দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার নজরের মধ্যে আসছিল নৌকোর বড় বড় কাঠ, গাছের গুঁড়ি আর সঙ্গে অনেক ছোট ছোট জিনিস, যেমন ভাঙা আসবাব, বাক্স-তোরঙ্গ, লাঠি, পিপে এমনি ধারা কত কি। ভয়ের পরিবর্তে তখন আমার মনে অস্বাভাবিক কৌতূহল। ভয়ঙ্কর মৃত্যুর সুনিশ্চিত মুহূর্তের দিকে যতই আমি অগ্রসর হচ্ছিলাম ততই যেন ক্রমশ বেশী পরিমাণে ঔৎসুক্য বেড়ে চলেছিল আমার। আমাদের সঙ্গে আর যে সব জিনিস ঘূর্ণাবর্তের তলায় নেমে চলেছিল সেগুলো অদ্ভুত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিয়ে দেখছিলাম আমি। কোন কোন জিনিস ঠিক কতখানি বেগে নেমে চলছিল সেইটে লক্ষ্য করে বেশ আনন্দ হচ্ছিল। সম্ভবত আমি উন্মাদই হয়ে গিয়েছিলাম। এক সময় বোধহয় বলে উঠলাম, 'এ ফার গাছটা এইবার ঠিক ভীষণ একটা ডুব দিয়ে তলিয়ে যাবে—ওটাকে আর দেখাই যাবে না।' আমি দেখলাম যে আমার হিসেব মিললো না। একটা জাহাজের ভাঙা অংশ কোত্থেকে হঠাৎ এসে পড়ল আর ফার গাছটার আগেই ওটা ছুটে গিয়ে ঘূর্ণাবর্তের তলায় চিরদিনের মত হারিয়ে গেল।

অনুমানের পর অনুমান করে চলেছি আর আমারই হিসেবের ভুলে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আমি হেরে যাচ্ছি, ঠিক এমনি অবস্থায় আবার আমি ভয়ে প্রায় আড়ষ্ট হয়ে পড়লাম।

'এ ভীতি নতুন কিছু নয় কিন্তু তারই সঙ্গে হঠাৎ একটা নতুন আশার আলোও যেন দেখলাম আমি। এই মুহূর্তে যে সব ঘটনা খুঁটিয়ে দেখছিলাম সেগুলো আর আমার পূর্বস্মৃতি এই আশা গড়ে তুলছিল। লোফোডেন দ্বীপের উপকূলে যে সব ভেসে থাকার উপযোগী বস্তুকে ছড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখেছি, সেগুলোই আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলে যে মস্কো-আবর্ত বহু জিনিস টেনে নেয় ঠিকই কিন্তু পরে সেগুলোকে তীরভূমিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। জিনিস-গুলোর অধিকাংশই অস্বাভাবিক ভাবে ভাঙাচোরা অবস্থায় ফিরে আসে কিন্তু কিছু জিনিস দেখেছি, যেগুলির গায়ে আঁচড়ের দাগও পড়েনি। এর অর্থ আমি ঠিক ঠিক বুঝতে পারিনি। ভেবেছি, এমন হতে পারে যে কিছু জিনিস এত ধীরে ধীরে আবর্তের ভেতর দিয়ে নেমেছে যে শেষ পর্যন্ত সেগুলো তলায় পৌঁছয়নি অথচ ইতিমধ্যে জোয়ার এসে গেছে। হয়ত এগুলো আবর্তের মধ্যে এসেছে কিছু পরে। অন্যদিকে যে জিনিসগুলো প্রথমেই ওর ভয়ঙ্কর আবর্তের মধ্যে এসে পড়েছে সেগুলো একেবারে তলিয়ে গিয়েছিল, তাই ভেঙেচুরে একাকার হয়ে গিয়েছে। ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন এ কথাও আমার মনে হয়েছে যে সেই আবর্ত সব জিনিসই আবার সমুদ্রের ওপর টেনে তুলেছে। আরও তিনটি মূল্যবান বিষয় আমি সাবধানতার সঙ্গেই লক্ষ্য করেছিলাম। প্রথমত বড় জিনিসগুলো ঘূর্ণাবর্তের তলায় নামে সবচাইতে তাড়াতাড়ি, দ্বিতীয়ত একই ওজনের জিনিস হলেও গোলাকার বস্তু অধিকতর দ্রুতবেগে তলদেশে নেমে যায় আর তৃতীয়ত লম্বা বা বেলনাকার জিনিস নামে সব চাইতে মন্থরগতিতে।

'বেঁচে ফিরে আসার পর আমি এখানকার একজন স্কুল শিক্ষকের সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতা নিয়ে বেশ কয়েকবার আলোচনায় বসেছি।

প্রকৃতপক্ষে 'গোলাকার' 'বেলনাকার' এ শব্দগুলো আমি ওঁর কাছ থেকেই পেয়েছিলাম। যদিও আমি ব্যাখ্যাগুলো সবই ভুলে গিয়েছি, উনি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, আকৃতি স্বাভাবিকভাবেই গতি নিয়ন্ত্রিত করে। উনিই বলেছিলেন যে লম্বা বা বেলনের মত জিনিস যদি আবর্তের মধ্যে পড়ে তাহলে সেটাই চোষণের পথে সবচাইতে বেশী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অন্য যে কোন আকারের বস্তু অনেক সহজে চোষণের বলি হয়ে যায়।

'একটা বিস্ময়কর পরিবেশই মূলত আমাকে এইসব খুঁটিনাটি জিনিসগুলোকে সযত্নে লক্ষ্য করতে উৎসাহিত করেছিল। আমরা যখন আমাদের নৌকো নিয়ে পাক খেয়ে চলেছিলাম তখন প্রত্যেকবার আবর্তনের সময় আমি পিপে, নৌকোর ভগ্নাংশ ইত্যাদি নানাধরণের জিনিস আমাদের পাশে পাশে দেখছিলাম। একটু পরে দেখেছি ওগুলো অনেক ওপরে থেকেই গিয়েছে। এত ওপরে যে মনে হয়েছে ওগুলো আদপে নামেইনি।

'সেই সঙ্কটজনক মুহূর্তে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে আমি একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। স্থির করলাম নৌকোর বাঁধন থেকে পিপেটাকে আলগা করে দিয়ে ওটাকে অবলম্বন করেই ভেসে যাব। পাশ দিয়ে একটা পিপে ভেসে চলেছিল। দাদার দৃষ্টি ওটার দিকে আকর্ষণ করে ওঁকে নানারকম ইঙ্গিত করে বোঝাতে চাইলাম যে আমি পিপেটাকে নিয়ে ভেসে পড়তে চাইছি। অনেক চেষ্টার পর মনে হল তিনি ব্যাপারটা বুঝলেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক নৌকোর লোহার অংশটা ছেড়ে উনি অন্য কোন অবলম্বন গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। মাথা নেড়ে ওঁর অসম্মতি জানিয়ে দিলেন আমাকে। জোর করে তাঁকে দিয়ে কিছু করানোর প্রশ্নই ছিল না তখন। ব্যাপারটা এমনি গুরুতর যে বিন্দুমাত্র বিলম্বও তখন বিপজ্জনক। যে দড়িগুলো দিয়ে পিপেটা বাঁধা ছিল তাড়াতাড়ি সেইগুলো খুলে নিয়ে ওগুলো দিয়েই নিজেকে পিপের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে ফেললাম। এরপর দাদাকে তাঁর ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়ে পরমুহূর্তেই জলে গড়িয়ে পড়লাম।

'আমি যা আশা করেছিলাম, ফলটা মোটামুটি দাঁড়ালো সেই রকমই। বুঝতেই পারছ যে আমি রক্ষা পেয়ে গেলাম আর সেই জন্যেই আজ এখানে বসে তোমাকে আমার অভিজ্ঞতার গল্প শোনাতে পারছি। কী ভাবে আমি রক্ষা পেলাম সেটা তুমি নিশ্চয় এখন অনুমান করতে পারছ। আর অল্প কয়েকটা কথা বলেই আমি কাহিনীটা শেষ করছি। মনে হয় নৌকো থেকে গড়িয়ে পড়ার পর ঘণ্টাখানেক পরে নৌকোটা হঠাৎ সোজা আবর্তের তলার দিকে দ্রুতবেগে নেমে গেল আর আমার দাদাকে নিয়ে ওর নিঃসীম গভীরতার মধ্যে তিন চারবার পাক খেয়ে চিরদিনের মত তলিয়ে গেল। এদিকে আমি যেখানটায় নৌকো থেকে লাফিয়ে পড়েছিলাম সেখান থেকে আবর্তের তলার যতখানি দূরত্ব, এই এক ঘণ্টার মধ্যে আমি তার বড় জোর অর্ধেকটা পাক খেয়ে এসেছি মাত্র। ইতিমধ্যে আবর্তের মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম আমি। ফানেলের মত ঘূর্ণাবর্তের খাড়াই অংশটা ধীরে ধীরে ছোট হয়ে এলো আর সেই সঙ্গে যে উন্মত্ত গতিবেগে সমুদ্রের জল এতক্ষণ আবর্তিত হচ্ছিল ;তার গতিও যেন অনেকখানি স্তিমিত হয়ে এলো। সেই ঘন কুয়াশা, সেই রামধনু সবই কোথায় মিলিয়ে গেল আর আবর্তের নীচের অংশটা হু হু করে উঁচু হয়ে উঠতে লাগল। আকাশ তখন পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে আর বাতাস পুরোপুরি থেমে গেছে। পূর্ণিমার উজ্জ্বল চাঁদ পশ্চিম দিগন্তে তখনো কিন্তু অকৃপণ ভাবেই আলো ছড়িয়ে চলেছে। হঠাৎ মনে হোল আমি সমুদ্রের ওপর এসে পড়েছি আর একটু দূরেই দেখতে পাচ্ছি লোফোডেন দ্বীপটাকে। কিছুক্ষণ আগে অবধি মস্কো-ঘূর্ণাবর্তটা যেখানে ছিল সে জায়গাটাকেও আমি বেশ চিনতে পারছিলাম। তখন ভাটার সময়, তবু ঝড়ের দরুণ যে বিশাল ঢেউ তৈরী হয়েছিল তারই সাহায্যে খুব তাড়াতাড়ি আমি উপকূলে এসে পড়লাম। একটা নৌকো যখন আমাকে জল থেকে তুলে নেয় তখন কিন্তু আমি ক্লান্ত আর বাক্‌শূন্য। এর কারণ হয়ত বা পরিবেশের ভয়াবহতা। যারা আমাকে টেনে তুলেছিল তারা

আমার চিরদিনের সঙ্গী, আমার পুরোনো বন্ধু। কিন্তু মৃত্যুর রাজ্য থেকে প্রত্যাবৃত আমাকে চেনা তাদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। একদিন আগে যে চুল দাঁড়কাকের মত মিশমিশে কালো ছিল সে সব চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল। ওরা বলে যে আমার মুখের আকৃতিটাই নাকি পুরো বদলে গিয়েছে। ওদের আমি এ কাহিনী শুনিয়েছি কিন্তু ওরা এর একবর্ণও বিশ্বাস করতে পারেনি। আজ আমার কাছ থেকে এ কাহিনী শোনার পর তুমিও লোফোডেনের জেলেদের মত একে অবিশ্বাস্য ভাববে কিনা জানিনা।

মনের খেলা

হ্যাঁ সত্যি! ভীষণ ভীতু প্রকৃতির মানুষ ছিলাম আমি এবং এখনো তাই। মারাত্মক রকমের ভীতু। কিন্তু তাই বলে আপনি আমাকে উন্মাদ বলবেন? অসুখে ভুগে ভুগে আমার ইন্দ্রিয়গুলো নিষ্ক্রিয় বা নিশ্চিহ্ন তো হয়ইনি, বরং যথেষ্ট পরিমাণে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। আর আমার শ্রবণশক্তির তীক্ষ্ণতা তো অকল্পনীয়। স্বর্গ-মর্তের সব কথা এমন কি নরকের কথাও আমি সব শুনতে পাই। এর পর আর আমাকে পাগল ভাবা নিশ্চয়ই উচিত হবে না। শুনুন না, কত শান্ত আর নিশ্চিন্তভাবে আমি পুরো কাহিনীটা আপনাকে বলে যেতে পারি।

বলতে পারবো না কখন ঐ ধারণাটা আমার মনের মধ্যে তৈরী হয়েছিল, তবে একবার তৈরি হওয়া মাত্র ওটা দিন-রাত্রি আমাকে জ্বালিয়েছে। ওর মধ্যে আবেগ বা উদ্দেশ্য কোন কিছুই ছিল না। বৃদ্ধকে আমি ভালোই বাসতাম। কোন দিনই কোন ক্ষতি তিনি আমার করেন নি বা অপমানও করেন নি। আমি তাঁর যে বস্তু নিতে চেয়েছিলাম তা সোনা-দানা নয়, তাঁর একটা চোখ। হ্যাঁ, কথাটা ঠিক। ওঁর একটা চোখ দেখতে ছিল হালকা নীল রঙের আর তার ওপর পর্দা পড়েছিল। শকুনদের চোখের মতোই দেখতে লাগত ওটাকে। ওই চোখ দিয়ে তিনি আমার দিকে তাকালেই আমার রক্ত হিম হয়ে যেত। বোধ হয় এই জন্যেই একটু একটু করে মন স্থির করে ফেললাম—আমি এই বৃদ্ধকে হত্যা করব আর চিরদিনের মতো ঐ ভয়ঙ্কর চোখের চাউনী থেকে মুক্তি নেবো।

ব্যাপার এইটুকু। এর জন্যে আপনি আমাকে উন্মাদ ভাবছেন। যারা উন্মাদ তারা ত কিছুই জানে না। কিন্তু আমি? আমাকে তো আপনি দেখছেন। বুঝতে পারছেন না আমি কত বুদ্ধিমানের মত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সাবধানী মানুষের মত, মনের সমস্ত চিন্তাকে কত নিপুণতার সঙ্গে গোপন করে অগ্রসর হয়েছিলাম। যেদিন বৃদ্ধকে

আমি হত্যা করি তার আগের সাতদিন তাঁকে আমি ভীষণ ভালো বেসেছি। প্রতিটি রাতেই, প্রায় বারোটার সময় আমি তাঁর ঘরের দরজা খুব সাবধানে খুলেছি। মাথাটা ঢুকোবার মতো ফাঁক করেই আমি দরজার ভেতর চারদিক ঢাকা একটা লণ্ঠন ঢুকিয়ে দিয়েছি। ওটা থেকে এক চিলতে আলোরও বাইরে বেরিয়ে আসার উপায় ছিল না। তারপর আমি মাথা ঢুকিয়েছি ঘরের মধ্যে। কত সাবধানে আমি ঘরে ঢুকতাম, দেখলে আপনি না হেসে পারতেন না। যাতে বৃদ্ধের ঘুম না ভাঙে সেজন্য আমি খুবই আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকতাম। উনি বিছানায় শুয়ে আছেন এইটুকু শুধু দেখবার মতো মাথাটা দরজার ফাঁক দিয়ে ঢুকোতেই আমার প্রায় এক ঘণ্টা সময় লেগে যেত। বলুন তো, কোন পাগল এত বুদ্ধিমান হয়? ঘরের মধ্যে মাথাটা ঢোকাবার পরেই আমি লণ্ঠনটাকে খুব সাবধানে খুলতে শুরু করতাম। খোলবার সময় লণ্ঠনের কব্জায় শব্দ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তাই আমি বিশেষ সাবধান হতাম। তারপর লণ্ঠন-টাকে একটুখানি ফাঁক করে পাতলা ছোট্ট একটা রশ্মি বৃদ্ধের শকুন-চোখটার ওপর ফেলতাম। প্রত্যেক বারই রাত দুপুরের দিকে। আমি সাত সাতটি রাত এভাবে লণ্ঠনের আলো ফেলে দেখেছি আর প্রত্যেকবারই চোখটাকে দেখেছি বন্ধ অবস্থায়। আমি তাই আমার কাজ করতে পারি নি। বৃদ্ধও আমাকে বিচলিত করেন নি, করেছিল তাঁর সেই অলক্ষুনে চোখটা। ভোর হলেই আমি তাঁর ঘরে গিয়েছি, যথেষ্ট সাহসের সঙ্গে কথা বলেছি, নাম ধরে হৃদ্যতার সঙ্গে সম্বোধন করে রাত কেমন কেটেছে তাও জানতে চেয়েছি। তাহলে বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই যে বৃদ্ধ কত ভালোমানুষ ছিলেন। রাতের বেলা তিনি যখন ঘুমিয়ে থাকেন, তখন প্রতি রাতে বারোটা নাগাদ আমি যে তাঁকে দেখে আসি, এরকম সন্দেহ তিনি একটি বারও করেন নি।

অষ্টম রাতের বেলায়ও আমার সাবধানতার অন্ত ছিল না। দরজা খোলার সময় বরং অন্যান্য রাতের চাইতে বেশী সাবধানীই ছিলাম। আমার কাজের গতি ঘড়ির মিনিটের কাঁটার চাইতেও

ছিল মন্থর। নিজের শক্তি আর বিচক্ষণতা সম্পর্কে সেই রাতে আমার যে ধারণা হয়েছিল তার আগে কোনদিনই তা আর হয় নি। আমি যে ধীরে ধীরে দরজা খুলে ঘরে ঢুকেছি একটা গোপন চিন্তা আর উদ্দেশ্য নিয়ে তা তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। এই জন্যেই বিশেষ করে আমার মনের মধ্যে জয়ের আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। আমার মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠেছিল। উনি হয়ত শুনতে পেয়েছিলেন কিছু তাই ভয় পেয়ে বিছানায় নড়ে উঠলেন। হয়ত আপনি ভাবছেন, ঐ মুহূর্তে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম, তা কিন্তু মোটেই নয়। চোর ডাকাতের ভয়ে উনি দরজা-জানালা বেশ ভালো করে বন্ধ করে দিতেন, তাই ঘরের মধ্যে ঘন কালো অন্ধকার জমাট বেঁধে উঠেছিল। আমার তাই জানা ছিল যে দরজা একটুখানি ফাঁক করলে উনি টের পাবেন না। আমি আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে ঢুকতে লাগলাম।

ঘরের মধ্যে মাথাটা ঢুকিয়ে আমি যেই লণ্ঠনটাকে ঠিক করে নিতে যাচ্ছি অমনি আমার বুড়ো আঙ্গুলটা পিছলে গিয়ে লণ্ঠনের টিনের বন্ধনীটার ওপর পড়ল। বৃদ্ধ বিছানার ওপর লাফিয়ে বসে চেঁচিয়ে উঠলেন, কে ওখানে ?

কিছু না বলে আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। পুরো এক ঘণ্টা আমি ওই ভাবে দাঁড়িয়েছিলাম, শরীরের একটা মাংসপেশীও নড়েনি। উনি যে শুয়ে পড়েছেন এমন কোন শব্দও শুনলাম না কিন্তু। উনি তখনো বিছানার ওপর বসে বসে শুনছিলেন--যেমন আমি রাতের পর রাত ওই ঘরের দেওয়ালে মৃত্যুর পদধ্বনি শুনেছি।

একটা ভয়বিহ্বল মৃদু আর্তনাদ শুনে বুঝলাম এর উৎস বেদনা বা দুঃখ নয়, বরং বিস্ময়-বিমূঢ় আত্মার রুদ্ধশ্বাস যন্ত্রণা। এর সঙ্গে পরিচয় ছিল আমার। মধ্যরাতের নিস্তব্ধ নির্জনতার মধ্যে নিদ্রিত পৃথিবীর বুকে যখন একমাত্র আমিই জেগে থেকেছি তখনই এই আর্তনাদ আমার গভীর অন্তর থেকে উঠে এসেছে। এরই

প্রতিধ্বনি আমাকে মাঝে মাঝে ভীতিগ্রস্ত করে অন্যমনস্ক করেও তুলেছে।

অসীম ধৈর্য নিয়ে দীর্ঘকাল প্রতীক্ষার পরও ওঁর শুয়ে পড়ার কোন শব্দ শুনতে পেলাম না। স্থির করলাম, আলোর ছোট্ট ফাঁকটাকে খুলে ফেলব। কত সন্তর্পণে, সত্যি বলছি ঠিক কত সন্তর্পণে, আমি কাজ করছিলাম তা আপনি অনুমান করতে পারবেন না। যাই হোক ধীরে ধীরে আমার লণ্ঠন থেকে একটা সূক্ষ্ম আলোর রশ্মি মাকড়শার তৈরী সরু সুতোর মত বৃদ্ধের শকুন-চোখের ওপর গিয়ে পড়ল।

চোখটা খোলা ছিল, পুরোপুরি খোলাই ছিল, আর সেই জন্যই ওটার ওপর আমার দৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলাম। সেই হাল্কা নীল রঙের ঘৃণ্য পর্দাপড়া চোখটাকে আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার অস্থি-মজ্জার মধ্যে একটা শীতল শিহরণ অনুভব করছিলাম। সেই জঘন্য চোখটা ছাড়া বৃদ্ধের শরীর বা মুখ কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না, কারণ আলোটার সূক্ষ্ম রশ্মি আমি ওঁর চোখের ওপরই নিবদ্ধ রেখেছিলাম।

তবু, আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার শ্বাস-প্রশ্বাসও প্রায় রুদ্ধ হয়েই ছিল। লণ্ঠনটাকে স্থিরভাবে ধরে আমি আলোর রশ্মিটাকে অকম্পিত চোখের ওপর ফেলে রেখেছিলাম। ওদিকে বৃদ্ধের সেই নারকীয় হৃদ্‌স্পন্দন বেড়েই চলেছিল, আর তার ধ্বনি দ্রুততর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্টতর হয়ে উঠছিল। প্রতিটি মুহূর্তে সেই ধ্বনি উচ্চতর হয়ে উঠছিল হয়ত এইজন্যেই যে বৃদ্ধ নিশ্চয়ই ক্রমশ ভীত হয়ে পড়ছিলেন। আমি তো আগেই স্বীকার করেছি যে, আমি নিতান্তই ভীতু প্রকৃতির মানুষ। গভীর রাত্রে নিস্তব্ধ গৃহের সেই অদ্ভুত শব্দ আমাকে দুর্দমনীয় ভীতিতে উত্তেজিত করে তুলল। তবু আমি নিজেকে সংযত করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। সে শব্দ কিন্তু বেড়েই চলল এবং এক সময় মনে হোল বৃদ্ধের বুকখানা ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে। এ-ও মনে হোল

এই শব্দ বৃদ্ধের প্রতিবেশীও শুনতে পাবে। ওঁর চরম মুহূর্ত সমাগত। বিকট চীৎকার করে আমি পুরো লণ্ঠনটার আচ্ছাদন খুলে ওঁর ঘরের মধ্যে দৌড়ে গেলাম। উনি একবার—হ্যাঁ, মাত্র একবারই ভয়ার্ত চীৎকার করে উঠলেন। পরমুহূর্তে আমি ওঁকে মেঝেয় টেনে ফেলে তাঁর ওপর ভারী বিছানাটা চাপা দিয়ে দিলাম। সব কাজ এ পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবেই সম্পাদিত হয়েছে দেখে আমি মৃদু হাসতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু এই ঘটনার পরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেই হৃদ্‌স্পন্দন মৃদুভাবে হলেও শোনা যাচ্ছিল। এতে আমি কিন্তু বিচলিত হই নি। জানতাম এ শব্দ দেওয়ালের ওপারে কেউ শুনতে পাবে না। কিছুক্ষণ পরে সেই ধ্বনি নিস্তব্ধ হয়ে গেল। মৃত্যু হয়েছে বুঝলাম। বিছানাটা সরিয়ে ফেলে মৃতদেহটাকে পরীক্ষা করে বুঝলাম মৃত্যুর পর তাঁর শরীর পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে। ওঁর বুকের ওপর বেশ কিছুক্ষণ হাত রেখেও স্পন্দন অনুভব করতে পারলাম না। বৃদ্ধের মৃত্যু সম্পর্কে আমার আর কোন সন্দেহ রইল না। নিশ্চিন্ত হলাম, সেই নারকীয় চোখ আর আমাকে কোনদিনই বিচলিত করবে না।

এখনো যদি আপনি আমাকে মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি মনে করেন, করুন। কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি, মৃতদেহটাকে কী পরিমাণ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে আমি লুকিয়ে ফেলেছিলাম তা শুনলে আপনার ধারণার পরিবর্তন হবেই হবে। ভোর হয়ে আসছিল বলে আমি দ্রুততার সঙ্গে কিন্তু নিঃশব্দে কাজ করে চললাম। মৃতদেহটাকে আমি প্রথমে টুকরো টুকরো করে ফেললাম। মাথা, হাত, পা—সব কিছু পৃথক করে নিয়ে মেঝে থেকে তিনখানা তক্তা সরিয়ে তার তলায় সব কিছু চাপা দিয়ে দিলাম। কাজটা এত নিখুঁতভাবে করেছিলাম, যে কোন মানুষের পক্ষেই সন্দেহ করার মত কিছু ছিল না। বৃদ্ধের চোখেও কোন অসঙ্গতি খুঁজে পেত না। কোথাও কোন রক্তের দাগ ছিল না, তাই ধোয়ামোছার প্রশ্নও ছিল না। পুরো কাজটা একটা টবের মধ্যে করেছিলাম কিনা তাই।

আমার কাজ যখন ফুরুল তখন ভোর চারটে। তখনো বেশ অন্ধকার ছিল। ঠিক চারটে যখন বাজল তখন রাস্তার ওপরকার দরজায় কেউ যেন ধাক্কা দিল। আমার তো ভয় করবার মত কিছুই ছিল না তখন, তাই বেশ হাল্কা মনেই দরজা খুলে দিলাম। তিনজন পুলিশ অফিসার যথেষ্ট ভদ্রভাবে নিজেদের পরিচয় জানিয়ে বললেন যে, প্রতিবেশীদের কাছ থেকে একটা খবর পেয়ে তাঁরা এসেছেন। প্রতিবেশীরা এই বাড়ী থেকে একটা আর্তনাদ শুনেছিল আর এখানে কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে বলেই আশঙ্কা করেছিল। এই খবর পেয়েই ওঁরা এখানে তদন্তের জন্যে এসেছেন।

অফিসারেরা খুবই খুশী হয়েছিলেন। অফিসারেরা কিন্তু তখনো বসে রয়েছেন, আর কথা বলেই চলেছেন। কানের মধ্যেকার সেই ধ্বনিটি ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে উঠল। খুব স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তায় অংশ গ্রহণ করে আমি ঐ অস্বস্তি থেকে রক্ষা পেতে চাইলাম। ওতে কোন লাভ হল না। শব্দটা বেড়ে চলল আর শেষ পর্যন্ত বুঝলাম শব্দটা আমার কানের মধ্যে হচ্ছিল না।

একটু চড়া গলায় বেশ স্বাভাবিক ভাবে কথাবার্তা বললেও আমি কিন্তু পর পর বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছিলাম। শব্দ তখনো বাড়ছে। বলুন, আমার তখন কী কর্তব্য ? একটা ঘড়িকে কাপড় দিয়ে জড়িয়ে নিলে যে ধরণের শব্দ হয়, সেইরকম শব্দ শুনছিলাম আমি। আমার দম নিতে কষ্ট হচ্ছিল। অফিসাররা কিন্তু কিছুই শুনছিলেন না। আমি আরও জোরে আর তাড়াতাড়ি কথা বলে চললাম তবু শব্দটা বাড়তেই থাকল। আমি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ছোটখাটো কথার তর্ক জুড়ে দিয়ে উঁচু গলায় কথা বলতে আর নানা রকমের বিকট মুখভঙ্গী করতে আরম্ভ করলাম। অফিসাররা কিন্তু তখনো বসে। ওঁদের মন্তব্য শুনে আমি বিরক্ত হয়েছি এই ভাব প্রকাশ করার জন্যে তখন আমি লম্বা লম্বা পা ফেলে মেঝেতে পায়চারী শুরু করেছি, কিন্তু শব্দটা বাড়ছে তো বাড়ছেই। আমি ক্রোধে উন্মত্তের মত হয়ে নানা ধরণের শপথ উচ্চারণ করতে লাগলাম। তখনো শব্দটা বাড়ছে—বাড়ছে—বাড়ছে। আপনি

বলতে চান, ওরা শব্দটা শুনতে পাচ্ছিল না? ঈশ্বর জানেন, আমার মনে হোল ওরা সব শুনে ও আমার ভয়ার্ত অবস্থাটা দেখে বেশ উপভোগ করছিল। এ কথা তখন আমি ভেবেছিলাম, এখনো সেই কথাই ভাবছি। কিন্তু যে নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা আমি সেই মুহূর্তে ভোগ করছিলাম তার চেয়ে অন্য যে-কোন শাস্তি বোধহয় কাম্য ছিল। এই রকম মর্মান্তিক উপহাসের চেয়ে অন্য সব কিছুই সহ্য করা তখন সহজ মনে হচ্ছিল। আমি ওঁদের ভণ্ডামির হাসি মোটেই সহ্য করতে পারছিলাম না। আমার মনে হোল হয় আমি ভীষণ জোরে চেঁচিয়ে উঠব, নয়ত তখনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ব।

শুনুন সেই শব্দ! শুনতে পাচ্ছেন? শব্দটা বাড়ছে! বাড়ছে! বাড়ছে!

'শয়তানের দল', চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। 'আর কপটতার প্রয়োজন নেই। অপরাধ আমি স্বীকার করছি। মেঝের তক্তাগুলো সরিয়ে ফেলুন। হ্যাঁ, এইখানে—এইখানে। শব্দটা বেরুচ্ছে ঐ ঘৃণ্য হৃদযন্ত্র থেকেই।'

লাফানে ব্যাঙ

রাজার মতো রসিকতা উপভোগ করার মানসিক শক্তি আমি অন্য কারোর মধ্যে দেখিনি। ওঁর জীবনে প্রিয়তম বস্তুই ছিল ঐ রসিকতা। ওঁর আনুকূল্য পাবার সর্বোত্তম পন্থা ছিল যে কোন মজার গল্প ওঁকে সুন্দর করে শোনানো। হয়তো এরই জন্যে ওঁর সাত সাতজন মন্ত্রীই ভাঁড় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ওঁরা সবাই রাজার মত বেশ নাদুস্‌নুদুস্‌ তেল চক্‌চকে দেহের অধিকারী আর রসিকতা-প্রিয় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি জানিনে রসিকতা করতে গিয়ে মানুষ মোটাসোটা হয় না দেহের মধ্যে চর্বি বেশি হলে মানুষ রসিক হয়ে ওঠে। তবে এ আমি জানি যে রোগা পাতলা রসিক মানুষ দুর্লভ।

ওই মন্ত্রীদের রাজা রসিকপ্রবর মনে করতেন আর রসিকতার মধ্যে শালীনতার প্রশ্ন তাঁর কাছে কোনদিনই বড় ছিল না। তাই খুব বড় রকমের রসিকতা উপভোগের জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করা রাজার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। এ বিষয়ে কলাসম্মত সূক্ষ্মতা প্রভৃতি তাঁর ভালোই লাগতো না তাই ভলতেয়ারের 'জাডিগ' তাঁর ভালো লাগতো না, লাগত র‍্যাবোর 'গারগাঁতুয়া' অনেক বেশী ভালো। তা ছাড়া মৌখিক বা বাচনিক রসিকতার চাইতে তাঁর আকর্ষণ ছিল রসিকতাপূর্ণ ঘটনার ওপর অনেক বেশী।

আমি যে সময়ের ঘটনা বর্ণনা করছি তখনো বৃত্তিধারী ভাঁড়েরা রাজদরবারের নিয়ম-মাফিক কাজ করে চলছিলেন। ইয়োরোপের বহু রাজা তখনো ভাঁড় পুষছিলেন। সেই সব ভাঁড়েরা আগেই মতই ময়লা পোষাকের ওপর ঘণ্টা বাঁধছে আর কোমরবন্ধ ব্যবহার করছে পূর্বপ্রথারই অনুসরণে। রাজাদের অনুগ্রহের দান কুড়িয়ে নিতে তখনো ওরা তাঁদের মনোরঞ্জনের আশায় মজার মজার কাজ করবার জন্যে প্রতিটি মুহূর্তে প্রস্তুত থাকছে।

আমাদের গল্পের নায়ক যে রাজা তিনিও প্রথানুযায়ী ভাঁড়

রেখেছিলেন একজন। ওঁর যে সাতজন মন্ত্রী গুরুগম্ভীর উপদেশাবলী বর্ষন করতেন তাঁদের সেই জ্ঞানগর্ভ বিষয়গুলির ভার কমানোর জন্যই বোধহয় তিনি ভাঁড়টির কাছ থেকে কিছু হাল্কা কথাবার্তা আশা করতেন। মনোরঞ্জনের জন্য নিযুক্ত ঐ ব্যক্তিটি শুধু ভাঁড় বলেই যে রাজার প্রিয়পাত্র ছিল তা নয়, সে তাঁর স্নেহ বেশী করে আকর্ষণ করেছিল খর্বকায় বিকৃতাঙ্গ মানুষ বলে। রাজদরবারে খর্বকায় মানুষের আধিক্যও দেখা যেত, রাজদরবারের দীর্ঘ কর্মবহুল সময় এই সব বেঁটেখাটো মানুষ আর ভাঁড়দের সঙ্গ ছাড়া তাঁদের কাটতোনা। ভাঁড়দের সঙ্গে এক হয়ে তাঁরা এই বামনদের হাসিঠাট্টা করতেন। আমি আগেই বলেছি যে পরিহাসপ্রিয় মানুষেরা মোটাই হন শতকরা নিরানব্বই ক্ষেত্রে। মনে হয় আমাদের কাহিনীর রাজা এই জন্যেই আত্মপ্রসাদ বোধ করতেন যে তাঁর ভাঁড়ের একই সঙ্গে তিনটি গুণ আছে। প্রসঙ্গত বলি, এই ভাঁড়টিকে তিনি 'লাফানে ব্যাঙ্' বলেই সম্বোধন করতেন।

আমি হলফ করে বলতে পারি যে ঐ ভাঁড়টিকে এই 'লাফানে ব্যাঙ' নামটি তার জন্মের পর নামকরণের সময় দেওয়া হয়নি। আসলে এ লোকটি সাধারণ অন্য দশজন মানুষের মত স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারতো না বলে মন্ত্রীসপ্তকের পরামর্শক্রমে এই বিশেষ নামটি ভাঁড়টিকে দেওয়া হয়েছিল। লোকটি লাফিয়ে লাফিয়ে অদ্ভুতভাবে চলত আর ঐ ভাবে চলবার সময় যে সব শব্দ করত তাতেই কাজ হোত। রাজার ছিল প্রকাণ্ড ভুঁড়ি আর বিরাট একটা মাথা। তবু দরবারের সবাই রাজার অপূর্ব সুন্দর শরীরের প্রশংসা করত। রাজা তাই তাঁর দরবারে এই বিকলাঙ্গ মানুষটিকে দেখে অসীম আনন্দ অনুভব করতেন।

আমাদের লাফানে ব্যাঙের পাগুলো ছিল বিকৃত। পথে বা ঘরের মেঝেতে চলতে হলে তার তাই খুব কষ্ট হোত। বেচারার এই ক্ষতি পুষিয়ে দেবার জন্য প্রকৃতি ওর হাতগুলোকে অদ্ভুত শক্তিশালী করে গড়ে দিয়েছিল। গাছে চড়ে বা দড়ি বেয়ে ওপরে

ওঠার কাজে ও যে দক্ষতার পরিচয় দিত তা ছিল দেখবার মত। লাফানে ব্যাঙের দেশ কোথায় জানিনে তবে এটুকু জানি যে বহু দূরের কোন অনুন্নত দেশ থেকেই সে এসেছে। রাজার কোন এক শক্তিমান ও বহু যুদ্ধজয়ী সেনাপতি কোন দূর দেশ থেকে এই মানুষটিকে আর একটি বালিকাকে জোর করে নিয়ে এসে এই রাজাকে উপহার দেন। বালিকাটি বেঁটে খাটো চেহারার হলেও কুৎসিত-দর্শন ছিল না। বরং তার হাত পা খুবই সুন্দর ছিল আর নাচিয়ে হিসেবে সে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিল।

দুই বন্দীর মধ্যে তাই অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই একটি অত্যন্ত হৃদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বস্তুত সেই সম্পর্ক তারা পরস্পর স্বীকার করে নিয়েছিল। লাফানে ব্যাঙ অনেক কায়দা কসরৎ করেও কারো মনোরঞ্জন করতে পারতোনা তাই ট্রিপেট্রার কোন সাহায্যেও আসতো না সে। অপরপক্ষে ট্রিপেট্রা তার ছোট শরীরের সৌন্দর্য নিয়ে সকলেরই প্রীতির পাত্রী হয়ে উঠেছিল আর রাজ-দরবারে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। এর ফলে লাফানে ব্যাঙকে সাহায্য করার কোন সুযোগ পেলেই সে তার সদ্‌ব্যবহার করত।

ঠিক মনে নেই কেন, তবে কোন এক ঘটনা উপলক্ষে রাজা একবার মুখোশ পরা বলনাচের ব্যবস্থা করলেন। মুখোশ নাচ বা ঐ রকমের কোন আনন্দোৎসবের আয়োজন হলেই তার সাফল্যের জন্য অনেক-খানি দায়িত্ব নিতে হোত লাফানে ব্যাঙ আর ট্রিপেট্রাকে। এসব ব্যাপারে আবার লাফানে ব্যাঙের যে উদ্ভাবনী প্রতিভা ছিল তা অস্বাভাবিক। মূকাভিনয়ের আয়োজন, নতুন নতুন চরিত্র সৃষ্টি, অপূর্ব দর্শন পোষাকের পরিকল্পনা—সবকিছুতে ও ছিল অসাধারণ। তাই লাফানে ব্যাঙ ছাড়া এই ধরনের উৎসব কল্পনাই করা যেতো না।

মুখোশনাচের রাতের জন্য ট্রিপেট্রার ব্যক্তিগত তত্ত্বধানে অপূর্ব সজ্জায় সজ্জিত হোল একটি হলঘর। উৎসবকে সফল করতে পারে এমন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা থেকে কেউই বিরত রইল না। রাজসভার প্রতিটি মানুষ নতুন কিছুর আশায় উত্তেজিত হয়ে উঠল।

কে কোন মুখোশ পরে কোন চরিত্রে অভিনয় করবে সে কথা স্থির হয়েছিল একসপ্তাহ, কোন কোন ক্ষেত্রে একমাস আগেই। সু-সিদ্ধান্তের অভাব কোথাও বিন্দুমাত্রও ছিল না, শুধু রাজা আর তাঁর সাতজন মন্ত্রী কী করবেন সেইটি তাঁরা স্থির করতে পারছিলেন না। এ যে কেন পারছিলেন না তাঁরা তা বলা শক্ত তবে মনে হয় বড় বাধা এসেছিল তাঁদের অস্বাভাবিক আকারের মোটা শরীরের দিক থেকে। যাই হোক তাঁরা শেষ পর্যন্ত পরামর্শের জন্যে লাফানে ব্যাঙ আর ট্রিপেট্টাকে ডেকে পাঠালেন।

দুটি ছোট্ট বন্ধু যখন রাজ দরবারে হাজির হোল তখন রাজা মন্ত্রীদের নিয়ে মদ্যপানে নিরত। তবু রাজার মেজাজ যে ভাল নেই তা দেখেই বোঝা গেল। রাজা জানতেন লাফানে ব্যাঙ মদ খায় না। মদ খেলে ও এত বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়ত যা তার ছোট্ট শরীরের পক্ষে নিতান্তই কষ্টকর হয়ে দাঁড়াত। তবু রাজা তাকে মদ খেতে আদেশ করলেন। রাজা কিন্তু এই ধরনের রসিকতাই পছন্দ করতেন তাই ব্যাঙকে বাধ্য করলেন মদ খেতে।

ব্যাঙ্ আর ট্রিপেট্টা দরবারে প্রবেশ করতেই রাজা বলে উঠলেন, 'ব্যাঙ্ নাও দেখি এই এক পাত্র মদ, চট্ করে তোমার অনুপস্থিত বন্ধুদের স্বাস্থ্য কামনা করে গিলে ফেল আর তারপর একটু চিন্তা করে বল দেখি কী করা যায়। আমরা চাই নতুন নতুন চরিত্র, বুঝলে, শুধু চরিত্র। সেগুলো এমন হবে যা একেবারে অসাধারণ। একঘেয়ে চরিত্র দেখে দেখে চোখ পচে গেছে। মদটা খেলে তবেই তোমার বুদ্ধি খুলে যাবে।'

সাধারণত এই রকম পরিস্থিতিতে ব্যাঙ রাজার কথা নিয়ে রসিকতাই করে, কিন্তু আজকের পরিবেশটাই ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। দিনটি ছিল ব্যাঙের জন্মদিন তাই 'অনুপস্থিত বন্ধুদের' উদ্দেশে মদ খেতে গিয়ে তার চোখে জল এসে গিয়েছিল। অত্যাচারী রাজার হাত থেকে সবিনয়ে মদের গেলাসটি ধরে নেবার পর উষ্ণ কয়েক ফোঁটা চোখের জল ওরই মধ্যে ঝরে পড়ল।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেঁটে মানুষটি যখন মদটুকু গলায় ঢেলে দিচ্ছিল তখন রাজা হো হো করে হেসে উঠে বললেন, 'ব্যাস্, এবার দেখ, ভালো এক গেলাস মদ কী বিরাট কাজ করতে পারে। এই তো, তোমার চোখ চক্ চক্ করতে শুরু করেছে।' হতভাগ্য ব্যাঙের চোখ কিন্তু চক্ চক্ নয় বরং মৃতই হয়ে আসছিল মদের তীব্র ক্রিয়ায়। মদের গেলাসটা টেবিলে রেখে ও এদিক ওদিক তাকাতে শুরু করল প্রায় উন্মাদের মতোই। রাজার রসিকতা খুব ভালো কাজ করেছে দেখে মন্ত্রীদের তখন কী আনন্দ!

সব চাইতে মেদবহুল ছিলেন প্রধান মন্ত্রী। তিনি বলে উঠলেন, 'এবার কাজের কথা হোক।' রাজা বললেন, 'নিশ্চয়ই। এবার বল দেখি ব্যাঙ কী করা যায়। আমরা ভালো ভালো চরিত্র চাই, হ্যাঁ চরিত্রই।' রাজা আবার হো হো করে হেসে উঠলেন। হাসলো ব্যাঙও কিন্তু সে হাসির মধ্যে স্বাভাবিকতা ছিলনা, কেমন যেন অর্থহীন হাসি।

রাজা প্রায় অধৈর্য হয়ে পড়েছেন তখন। বললেন, 'বল, বল, তাড়াতাড়ি বল, কী ভাবতে পারছ না কিছু?'

—আজ্ঞে না। আমি কিন্তু খুব নতুন কিছু ভাবতে চেষ্টা করছি। ব্যাঙ কথা বলল কিছুটা দুর্বোধ্য ভঙ্গীতে। মদের ঘোরে সে যে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল।

—চেষ্টা করছি মানেটা কী? চেঁচিয়ে উঠলেন বদরাগী রাজা। পরক্ষণেই বললেন, 'ও বুঝতে পেরেছি। তুমি একটা গোমড়ামুখো মানুষ। তোমার আরও মদ দরকার। এই নাও, আরো খানিকটা গিলে ফেল।' বলেই রাজা গেলাসে বেশ খানিকটা মদ ঢেলে বিকলাঙ্গ মানুষটির দিকে এগিয়ে দিলেন। বেচারার তখন দম বন্ধ হয়ে আসছে। সে শুধু বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে

দৈত্যের মত হুঙ্কার ছেড়ে রাজা বলে উঠলেন 'খাচ্ছো না যে? শীগগির খাও বলছি, না হলে—' তখনো কিন্তু ব্যাঙ ইতস্তত করছে।

রাজা রাগে লাল হয়ে উঠেছেন তখন। মন্ত্রীরা বোকা হাসি হাসছেন আর ওদিকে ট্রিপেট্টার মুখ প্রাণহীন পাণ্ডুর হয়ে উঠেছে। সে ধীরে ধীরে রাজার দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বন্ধুর জন্য মার্জনা ভিক্ষা করল।

মেয়েটির স্পর্ধায় রাজা কিছুটা বিস্মিত হলেন। কিভাবে নিজের ঘৃণা প্রকাশ করবেন, সেই চিন্তাই তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত কোন কথা না বলে উনি মেয়েটিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন আর তার মুখের উপর ছুঁড়ে মারলেন গেলাসের সবটুকু মদ।

একটি দীর্ঘশ্বাসও ফেলল না মেয়েটি। একবার উঠে দাঁড়িয়ে পূর্বের মতই টেবিলের তলায় হাঁটু গেড়ে বসল সে।

সারা হলঘরের মধ্যে নিস্তব্ধতা জমাট বেঁধে উঠল এমন ভাবে যে একটা পাতা বা পালক খসে পড়লেও তার শব্দ অনায়াসে শোনা যেতো। কিছুক্ষণ পরে ঘরের ভেতর থেকে একটা খরখরে কর্কশ শব্দ শোনা গেল শুধু। বেঁটে লোকটির দিকে ফিরে উত্তেজিত কণ্ঠে রাজা প্রশ্ন করলেন, 'কেন, কেন ওরকম শব্দ করছ তুমি?'

মদের ঝোঁক তখন অনেকখানি কমে এসেছে। ক্রুদ্ধ রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলে উঠল, 'আমি? আজ্ঞে না, আমার সে সাহস মোটেই নেই।' একজন মন্ত্রী বললেন, 'আমার মনে হয় শব্দটা বাইরে থেকেই আসছে। যতদূর মনে হয় ওখানে একটা টিয়া পাখী তার খাঁচাটায় ঠোঁট ঘষছে।'

ঘটনাটার একটা মনের মত ব্যাখ্যা পেয়ে রাজা খুশী হলেন। তবুও তিনি বলে উঠলেন, 'ঠিকই, তবে কি জানেন, আমি মনে করছিলাম ঐ শয়তানটা দাঁত কড়মড় করছে।'

এবার ব্যাঙ্ হো হো করে হেসে উঠল আর সেই সুযোগে তার বড় বড় আর কুৎসিত দাঁতগুলো সব বেরিয়ে পড়ল। রাজা ত নিজেই ভাঁড়ের মত কাজ করছিলেন তাই অন্যের হাসিতে আপত্তি করার শক্তিও ছিল না তাঁর। তাছাড়া মদও গিলেছিলেন প্রচুর। এবার তিনি শান্ত হলেন আর আরো একগেলাস মদ অবলীলা-

ক্রমে গলায় ঢেলে ফেললেন। ততক্ষণে ব্যাঙ্ প্রকৃতিস্থ হয়েছে আর মুখোশনাচের মতলব তার মাথায় এসে গিয়েছে।

যেন মদ সে ছোঁয়নি এমনি শান্ত ভাবেই ব্যাঙ্ বলে উঠল, 'ঠিক কী ভাবে ধারণাটা মাথায় এলো বলতে পারিনে কিন্তু আপনি যখন মেয়েটিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন আর জানালার ওপাশে টিয়ে পাখী কিম্ভূতকিমাকার শব্দ করে উঠল তখনি অন্য একটা চিন্তা আমার মাথায় এসে গেল। আমরা যখন মুখোশ নাচে নাচি তখন কিন্তু এই চরিত্রগুলোতে অভিনয় করি। কিন্তু সে যাই হোক এক্ষেত্রে অসুবিধে হোল এই যে এর জন্যে দরকার আটজন লোক আর—'

বেঁটের উদ্ভাবনী শক্তিতে রাজা তখন ভীষণ প্রীত। উনি হেসে বললেন, 'কেন? আমরা ত আটজনই আছি এখানে, সাতজন মন্ত্রী আর আমি। এখন বল দেখি তোমার চিন্তাটা কী?'

বিকলাঙ্গটি বলে উঠল, 'আমরা একে শৃঙ্খলাবদ্ধ আটটি ওরাঙ্ ওটাঙ্ বলি। ঠিকমত অভিনয় করলে এ একেবারে তুলনাহীন।'

'আমরা তাই করব, ঐটেই অভিনয় করব আমরা'—বেশ শান্ত-ভাবে চোখ বন্ধ করে বলে উঠলেন রাজা।

লাফানে ব্যাঙ্ বলল, 'এই অভিনয়টার সৌন্দর্য কোথায় জানেন, তা হোল ওটায় মেয়েদের মধ্যে যে ভীতির সঞ্চার হয়, সেইখানে।'

'বাঃ, সুন্দর'—রাজা আর মন্ত্রীরা একই সঙ্গে বলে উঠলেন।

ব্যাঙ্ বলে চলল, 'আপনাদের ওরাঙ্ ওটাঙ্ সাজানোর ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন। ও আমি এমন নিখুঁত ভাবেই করে দোব যে এখানে যারা আসবে তারা আপনাদের জন্তু ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারবে না। এতে ওরা বিস্মিত হবে আর ভয়ও পাবে ভীষণ।'

রাজা ভীষণ খুশী হলেন আর বললেন, 'এ একেবারে অতুলনীয়। জানো লাফানে ব্যাঙ্, আমি তোমার ভাগ্য ফিরিয়ে দোব, মানুষের মত মানুষ বানিয়ে দোব তোমাকে। আমরা যে চেনটা ব্যবহার করব তার ঝন্ ঝন্ শব্দ সব কিছুকে আরো দুর্বোধ্য করে তুলবে। আপনারা এমন ভাব করবেন, যেন মালিকের কাছ থেকে

একসঙ্গে সবাই পালিয়ে এসেছেন। যেখানে সুন্দর সুন্দর পোষাক পরা উঁচুদরের ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলারা জমায়েত হন, সেখানে এই মুখোশ নাচটা যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তা আপনারা অনুমানই করতে পারবেন না। এর বৈসাদৃশ্যটি অসাধারণ।'

'এইটিই করব আমরা'—বললেন রাজা। তারপর বেলা হয়ে যাচ্ছিল বলে সবাই উঠে পড়লেন আর ব্যাঙের প্রস্তাবটিকে কার্যকরী করে তোলার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

আটজনকে ওরাঙ্ ওটাঙ্ সাজানো এমন কিছু কঠিন ব্যাপার ছিল না কিন্তু উদ্দেশ্য সাধনের দিক থেকে পরিকল্পনাটি বাস্তবিকই অপূর্ব হয়েছিল। আমি যে সময়ের কাহিনী বলছি তখন সভ্যদেশে ঐ জন্তু দেখা যেতো না। বেঁটে মানুষটি যেভাবে ওদের সাজিয়েছিল তাতে আকৃতিগত সাধর্ম্য তো ঘটেছিলই কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা ওঁরা সৃজন করেছিলেন একটা ভয়াবহ ঘৃণ্য পরিবেশ।

রাজা আর মন্ত্রীদের প্রথমে খুব আঁটসাট পোষাক পরিয়ে তার ওপর আলকাতরা লাগানো হোল। এর পর কেউ কেউ বললেন তার ওপর পালক লাগালে বেশ মজার হবে। প্রস্তাবটা কিন্তু ব্যাঙ্ সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করে দিল ও বলল জন্তুগুলোর গায়ের লোম সম্পর্কে ধারণা দিতে গেলে এ ক্ষেত্রে শণই ব্যবহার করতে হবে। আলকাতরার ওপর পুরু করে শণ বসিয়ে দেওয়া হোল। এর পর আনা হোল মস্ত বড় একটা শেকল, ওটাকে প্রথমে রাজার কোমরে বাঁধা হোল তারপর এক এক করে বাকী সাতজন মন্ত্রীকে বাঁধা হোল ঐটেতে। আটজন শেকলে বাঁধা অবস্থায় যখন দাঁড়ালেন তখন একটা বৃত্তই সৃষ্ট হোল।

সিম্পাঞ্জী বা ঐ ধরণের বড় বড় বাঁদর ধরে বাঁধার জন্যে বোর্নিও প্রভৃতি দ্বীপের লোকেরা যে ধরনের বাঁধন ব্যবহার করে, ব্যাঙ্ শেকলের শেষ অংশটুকু নিয়ে ঐ ভাবে ওঁদের আটজনকে বেঁধে ফেলল। এতে ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক লাগল দেখতে।

যে বিরাট হলঘরটাতে মুখোশ নাচের ব্যবস্থা হয়েছিল সেটি

ছিল গোলাকার। ঘরটির দেওয়াল খুব উঁচু আর ওপরের একটি জানালা দিয়েই সূর্যের আলো ঘরের মধ্যে এসে পড়ত। একটা বিরাট ঝাড়লণ্ঠন শেকল দিয়ে ঘরের মাঝখানে ওপর থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওটার ভারসাম্য ঠিক রাখবার জন্য একটা ভারি জিনিস ব্যবহার করা হয়েছিল কিন্তু ঘরের মধ্যে ওটা থাকলে বিশ্রী দেখাবে বলেই ওটাকে গম্বুজের ওপর ছাদে তুলে দেওয়া হয়েছিল।

হলঘরটাকে সাজিয়ে তোলার দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল ট্রিপেট্টার ওপর। কতকগুলো খুঁটিনাটি ব্যবহারে সে অবশ্য বেঁটের পরামর্শ নিয়েছিল। তারই পরামর্শমত এই মুখোশনাচ দিনটির জন্যে ঝাড়লণ্ঠনটি সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার বক্তব্য ছিল এই যে ঘরে খুব ভিড় হবেই আর তাই বহু লোক ঘরের মাঝখানে দাঁড়াতে বাধ্য হবে। ঝাড়-লণ্ঠন থেকে গরমের দিনে মোম গলে পড়ে ওঁদের দামী পোশাক সব মাটি করে দেবে। তার বদলে হলের মধ্যে কিছু দেওয়ালগিরি বসানো হয়েছিল আর ঘরের দেওয়ালে গোটা পঞ্চাশ ষাট যে মূর্তি ছিল তাদের ডান হাতে সুগন্ধি জ্বলন্ত মশাল রেখে দেওয়া হয়েছিল।

লাফানে ব্যাঙের পরামর্শমতই দুপুর রাত পর্যন্ত ঐ আটজন ওরাঙ্‌ ওটাঙ্‌ বাইরে অপেক্ষা করছিল। ও চেয়েছিল এই যে ঘরটা মুখোশনাচের লোকে ভরে উঠুক তার পর ওরা ঢুকবে। রাত বারোটা বাজার ধ্বনি মিলিয়ে যাবার আগেই ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে পড়ল—বরং বলা উচিত শেকলে বাঁধা ছিল বলে ওরা আটজন গড়িয়ে এসে পড়ল হলের ভেতর।

মুখোশনাচের আসরে যারা এসেছিল তাদের উত্তেজনা আর রাজার আনন্দ সবই হয়ে দাঁড়িয়েছিল অপর্যাপ্ত। ওখানে এমন লোক প্রায় ছিলই না বলা যায় যারা ওই আটজনকে ওরাঙ্‌ ওটাঙ্‌ বা ঐ ধরনের কোন জন্তু ভাবেনি। অবশ্য এই রকম আশাই করা গিয়ে-ছিল। মেয়েদের অধিকাংশই জ্ঞান হারালেন। রাজা আগেই আসরে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে আসা বারণ করে দিয়েছিলেন। তা না করলে ওঁদের এই মজা দেখানোর বদলে হয়ত অনেক রক্তই ঝরে পড়ত সেদিন।

সবাই এবার দৌড় দিতে শুরু করল দরজার দিকে। ওদিকেও পথ ছিল বন্ধ, রাজা আদেশ দিয়ে রেখেছিলেন ওঁরা ঢুকে পড়ার পরই যেন দরজায় তালা লাগিয়ে চাবিটা লাফানে ব্যাঙের কাছে জমা দিয়ে দেওয়া হয়।

সবাই যখন আত্মরক্ষার জন্যে ব্যস্ত তখন বোধ হয় ঝাড়লণ্ঠন ঝুলোবার শেকলটার দিকে নজর পড়ল অনেকের। ওটা ওপর থেকে তলায় নেমে এসেছিল আর ওর আংটাটি মেঝে থেকে ফুট তিনেক ওপরে ঝুলছিল।

রাজা আর তাঁর সাত সঙ্গী হলঘরের চারদিকে পাক খেয়ে এসে পৌঁছনো মাত্রই সেই ঝাড়লণ্ঠনের শেকলটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন। লাফানে ব্যাঙ্ ওঁদের অলক্ষে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। যেই রাজা আর মন্ত্রীদের শেকল ঝাড়লণ্ঠনের শেকলের সঙ্গে জড়িয়ে গেল অমনি ব্যাঙ্ এমন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে লণ্ঠনের শেকল ধরে টান লাগালো যাতে ওটা আরও খানিক উপরে উঠে গেল আর আটজন একসঙ্গে জড় হয়ে গিয়ে পরস্পরের মুখোমুখী হয়ে পড়লেন।

ততক্ষণে মুখোশধারীরা কিছু পরিমাণে ভয় কাটিয়ে উঠতে পেরেছে আর পুরো ঘটনাটার মজা উপভোগ করতে আরম্ভ করেছে। ওরা তখন বাঁদরগুলোর বিবাদ দেখে হো হো করে হাসতেও শুরু করেছে। ওদের হাসির ভেতর থেকেই হঠাৎ ব্যাঙের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'ছেড়ে দিন, আমাকে ছেড়ে দিন দেখি। আমি বোধ হয় ওঁদের সবাইকে চিনিয়ে দিতে পারব। তবে কিনা ওঁদের একটু ভাল করে দেখতে হবে আমাকে।'

ভিড় পেরিয়ে ব্যাঙ্ গিয়ে পৌঁছল দেয়ালের কাছে। একটা মূর্তির হাত থেকে জ্বলন্ত মশাল তুলে নিয়ে ও এসে গেল হলঘরের মাঝখানে। তারপর বাঁদরের মত অবলীলাক্রমে লাফিয়ে রাজার মাথায় পৌঁছে সেখান থেকে ঝাড়লণ্ঠনের শেকলটা ধরে কয়েক ফুট ওপরে উঠে গেল সে। সেখান থেকে জ্বলন্ত মশালটা ওরাঙ্ ওটাঙ্ দলের ওপর ঝুলিয়ে ব্যাঙ্ চেঁচিয়ে বললে, 'দাঁড়ান, এবার ঠিক বলতে পারব কোনটি কে।'

ব্যাঙের এই রসিকতায় ওরাঙ্ ওটাঙ্‌রা আর অন্যেরা তখন হেসেই অস্থির। এমন সময় ব্যাঙ্ তীক্ষ্ণ একটা শিস দিয়ে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে লণ্ঠনের শেকলটা প্রায় ফুট ত্রিশ ওপরে উঠে গেল। শেকলটা এতটা উঠে যাবার পরও ব্যাঙ্ আর আটটি ওরাঙ্ ওটাঙের মধ্যে দূরত্ব একই রইল আর তখনো ওদের চিনিয়ে দেবার জন্যে সে সমানে জ্বলন্ত মশাল রাজা আর তাঁর সাত জন সঙ্গীর ওপর দুলিয়ে চলেছে।

উত্তেজিত ভাঁড়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'হ্যাঁ, ঠিক, আমি ঠিক মতোই চিনতে পেরেছি এঁদের। এঁরা কারা এখন আর চিনতে বাকী নেই আমার।' চেনবার চেষ্টা করছে এ রকম ভান করে সে তখনো মশাল দুলিয়ে চলেছে। পর মুহূর্তে রাজাকে খুঁটিয়ে দেখার উদ্দেশ্যেই যেন, মশালটি তাঁর ওপর নামিয়ে আনল ব্যাঙ। সঙ্গে সঙ্গে আলকাতরা মাখা শনের জামায় আগুন লেগে গেল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আটটি ওরাঙ্ ওটাঙ্ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আর দর্শকেরা আর্তনাদ করে উঠল ভীষণ ভাবে। তলা থেকে কোন সাহায্যই ওদের কাছে পৌঁছে দেবার উপায় ছিল না।

আগুন আরো যখন বেড়ে উঠল তখন ব্যাঙ্ শেকল বেয়ে আরও খানিক ওপরে উঠে গেল। সে তখন সকলের নাগালে বাইরে। যখন ব্যাঙ্ ওই ভাবে শেকল বেয়ে উঠে যাচ্ছিল তখন হলঘরের মধ্যে সবাই নীরবে ঘটনাটা লক্ষ্য করছিলেন। এই নীরবতার সুযোগ নিয়ে সে আবার বলে উঠল, 'এখন আমি নির্ভুল ভাবেই সব কিছু দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি কী ধরনের মানুষ ওঁরা। ওঁরা হলেন মহামান্য রাজা আর তাঁর সাতজন মানিনীয় মন্ত্রী—যে রাজা আত্মরক্ষায় অসমর্থ একটি মেয়েকে নির্মম ভাবে আঘাত করেন আর যে মন্ত্রীরা সেই জঘন্য কাজে রাজাকে আনন্দের সঙ্গে সাহায্য করেন। আমি? আমি হলাম লাফানে ব্যাঙ্, একটা ভাঁড় মাত্র, আর এইটিই আমার শেষ ভাঁড়ামী।'

আলকাতরা আর শনের অসম্ভব পরিমানে দহনশীলতার জন্যেই

ব্যাঙের ছোট্ট বক্তৃতা শেষ হতে না-হতেই আটটি বীভৎস দগ্ধ মৃতদেহ একটি বিরাট কৃষ্ণকায় পিণ্ডের মত ঝুলতে লাগল। ওটা থেকে কাউকেই তখন আর চেনবার উপায় ছিল না। বিকলাঙ্গ মানুষটি ওই শবপুঞ্জের ওপর জ্বলন্ত মশালটি ছুঁড়ে ফেলে ধীর স্থির গতিতে শেকল বেয়ে ছাদে উঠে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সবাই অনুমান করেন যে এই জ্বলন্ত প্রতিহিংসার জন্য সহায়তা করেছিল ট্রিপেট্টা আর এই জন্যেই সে হলঘরের ছাদে কোথাও লুকিয়ে ছিল নিশ্চয়ই। এই ঘটনার পর ওদের কাউকেই আর ও অঞ্চলে দেখা যায়নি। মনে হয় ওরা দুজন ওদের দেশেই পালিয়ে গিয়েছিল।

জনতার মানুষ

জার্মান ভাষায় রচিত কোন একটি গ্রন্থ সম্পর্কে বলা হয় যে ওটি পড়বার জন্য রচিত হয়নি। একই ভাবে বলা যায় যে কিছু গোপনীয় তথ্য আছে যেগুলি কোনদিনই প্রকাশযোগ্য নয়। এই ধরণের অত্যন্ত গোপনীয় তথ্যের ঘৃণ্য বোঝা বয়েই কিছু মানুষ রাত্রির নির্জনতার মধ্যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এরা মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে স্বীকারোক্তি করে আর করুণভাবে তাকিয়ে থাকে সবার মুখের দিকে। তারপর এক সময় হতাশার ভারে ওদের কণ্ঠরোধ হয়ে আসে আর সব ফুরিয়ে যায়। তবুও মানুষ মাঝে মধ্যে এই ধরণের ভয়ঙ্কর বোঝা বয়ে বেড়ায় আর শেষ পর্যন্ত সেইসব বোঝা নিয়েই কবরের মধ্যে চলে যায়। হয়ত এই জন্যেই অপরাধমূলক সব কাজের মৌলিক কারণগুলো অজ্ঞাতই থেকে যায়।

খুব বেশী দিন আগের কথা নয়। শরৎসন্ধ্যায় লণ্ডনের ডি— কফিহাউসের বড় জানালার পাশে আমি বসেছিলাম। মধ্যে আমি বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, অবশ্য সম্প্রতি আমি সুস্থ হয়ে উঠছিলাম আর আমার মন মেজাজও ভালোই ছিল। মন আমার বেশ শান্ত ছিল আর সব কিছু সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু বোধ করছিলাম। আমি একটা সিগার ধরিয়ে খবর কাগজ নিয়ে বসেছিলাম। বিকেল বেলাটা বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠছিল, কখনো কাগজের বিজ্ঞাপন পড়ে, কখনো ঘরের মধ্যে যাঁরা আসছিলেন তাঁদের সান্নিধ্য পেয়ে আবার কখনো ঘোলাটে কাচের জানালা দিয়ে বড় রাস্তাটা দেখতে দেখতে সময় বেশ কেটে যাচ্ছিল।

কফিহাউসের সামনে ঐ রাস্তাটা শহরের অন্যতম প্রধান রাস্তা। সারাদিন লোকজনে ওটা চঞ্চল থাকত। সন্ধ্যার অন্ধকার যতোই ঘনিয়ে আসতে লাগল, লোকের ভিড়ও যেন ততো বাড়তে লাগল, রাস্তার আলোগুলো জ্বলে ওঠার পর দেখা গেল কফিহাউসের দরজার

সামনে দিয়ে জনতার দু'টো স্রোত যেন অবিচ্ছিন্নভাবে বয়ে চলেছে। এই রকম কোন সন্ধ্যা আমি কফিহাউসে বসে কাটাইনি তাই জন-সমুদ্রের এই অভিনবত্ব আমার খুবই ভাল লাগছিল। ঘরের ভেতরের কোন জিনিসের ওপর আমার আর তখন নজর ছিলনা। সম্পূর্ণ মনোযোগ গিয়ে পড়েছিল বাইরের জনস্রোতের ওপর।

গোড়ার দিকে আমার চিন্তাটা ছিল নিতান্তই সাধারণ নির্বস্তুক ধরনের। পথিকদের দেখছিলাম সমষ্টিগতভাবেই। কিন্তু একটু পরেই আমি সবকিছু খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলাম, তাদের পোষাক আকৃতি চলন-ভঙ্গী এমন কি মুখের ভাবভঙ্গীতেও মনোযোগী হয়ে উঠলাম।

বেশীর ভাগ লোকেদের সুখী আর কাজের মানুষ মনে হচ্ছিল। ওরা সবাই যেন সবার আগেভাগে চলে যাবার চেষ্টা করছিল। ভুরু কুঁচকে সামনের দিকে তাকিয়ে সবাই এগিয়ে চলেছিল। মজার কথা, পথে অন্য কোন পথিকের সঙ্গে ধাক্কা লাগলেও বিরক্ত হচ্ছিল না কেউই। বিন্দু-মাত্রও অধৈর্য না হয়ে জামাকাপড় সামলে নিয়ে আবার হন হন করে হেঁটে চলেছিল। বেশ কিছু লোককে বড় বেশী ব্যস্ত মনে হচ্ছিল। লোকারণ্যের মধ্যেও তারা যেন নিঃসঙ্গ এই ভাবে নিজেরা কথা বলে, অঙ্গভঙ্গী করে খুশী মনে হেঁটে চলেছিল। চলার পথে বাধা পেলে এরা কথা বলা বন্ধ করছিল বটে কিন্তু মুখভঙ্গীর মাত্রা বেড়ে যাচ্ছিল ওদের। একটু হেসে ওরা আবার এগিয়ে যাচ্ছিল। কেউ ধাক্কা দিলে ওরা মাথা নীচু করছিল তাদেরই কাছে যারা ওদের ধাক্কা দিচ্ছিল। একটুখানি হতবুদ্ধি অবস্থায়ও পড়ছিল ওরা। দু'ধরনের পথিকদের সম্পর্কে যা বললাম এর চাইতে নতুন কিছু আর দেখা যাচ্ছিল না। সবার পোষাক পরিচ্ছদ ছিল মোটামুটি ভদ্র আর সুন্দর। ওরা নিশ্চয় ব্যবসায়ী, উকিল প্রভৃতি শ্রেণীর সম্মানিত মানুষ। কর্মব্যস্ত আর অবসর উপভোগের জন্যে আগ্রহী মানুষের দল। ওদের দেখে নতুন কোন চিন্তাই আমার মনে এল না।

কেরানীদের দুটো দলকেও পরিষ্কার ভাবে বেছে নিতে পারছিলাম আমি। ওদের মধ্যে একদল ছিল জাঁকালো অফিসের নিম্নপদস্থ

কেরাণী। ওই সব যুবকদের আঁটসাঁট জামাকোট, চকচকে জুতো, তেল চকচকে মাথার চুল আর ঘৃণাব্যঞ্জক ঠোঁটগুলো বেশ চিনতে পারছিলাম। ওদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক দেখে মনে হয় ওগুলো বছর দেড়েকের মধ্যে বরাত দিয়ে করিয়ে নেওয়া। সমাজের আদব-কায়দা-দুরস্ত ভদ্রলোকদের মত এই মানুষগুলিকে নতুন কোন সংজ্ঞা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

পুরোনো বনেদী অফিসের কিছু বয়স্ক কেরানীদের বেছে নিতেও ভুল হোলনা আমার। কালো বা বাদামী রঙের ঢিলে ঢালা জামা প্যান্ট, সাদা ওয়েস্ট কোট, চওড়া-মাথা ভারী বুটজুতো, বেশ মোটা মোজা প্রভৃতি দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে অফিসে ওঁরা বেশ আরামে সময় কাটান। ওঁদের প্রত্যেকেরই মাথায় ছিল ছোটখাটো টাক আর ডানকানে কলম গুঁজে রাখার অভ্যাসের দরুন ওটা একটু অন্য রকম হয়ে উঠেছিল। ওঁদের ঘড়ির চেন ছিল সোনার আর মাথায় টুপীটা পরে নেবার জন্যে বা ঠিক করে বসিয়ে নেবার জন্যে ওঁরা ব্যবহার করছিলেন দু'হাত। ওঁদের ভাবভঙ্গীর মধ্যে বেশ একটা বনেদী ভদ্রলোকের ভাব আনার চেষ্টা ছিল।

খুব চকচকে পোষাক পরা লোকজনও দেখছিলাম আমি। বুঝতে অসুবিধে ছিলনা যে ওরা পকেটমারের দল। আজকের বড় শহর-গুলো ওদের বৃত্তিধারী লোকজনে ছেয়ে গেছে। আমার বুদ্ধিতে কুলোচ্ছিল না কী করে প্রকৃত ভদ্রলোকেরা ওইগুলোকে ভদ্রলোক ভাবেন। ওদের চওড়া মনিবন্ধ, আকৃতি আর বড় বেশী খোলাখুলি আচরণ দেখেই চিনে ফেলা উচিত যে ওরা পকেটমার।

জুয়াড়ীদেরও দেখছিলাম আমি। সংখ্যা তাদের কম ছিলনা। ওদের পোষাক-ছিল নানা রকমের, গুণ্ডাদের পোষাক থেকে ধর্ম-যাজকদের পোষাক—ওরা সব কিছুই ব্যবহার করছিল। কিন্তু তাই বলে জুয়াড়ী হিসেবে চিনে নিতে কোন কষ্ট হচ্ছিল না। কালো চোখমুখই ওদের চিনিয়ে দিচ্ছিল। অবশ্য আরও দুটো চিহ্ন দেখে আমি ওদের চিনে নিতে পারছিলাম। ওরা কথা বলছিল খুব সাব-

ধানে নীচু গলায় আর বুড়ো আঙুল বাড়িয়ে কোন একদিকে ইঙ্গিত করছিল। যাদের সঙ্গে ওরা কথা বলছিল তারা সবাই ভিন্ন শ্রেণীর লোক কিন্তু জুয়ার ব্যাপারে অবশ্যই সমগোত্রীয়। এঁরা বুদ্ধির জোরে অর্থ উপার্জন করতে অভ্যস্ত ভদ্রলোক। জুয়াড়ীরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে জনসাধারণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। একদল হলেন ফুলবাবু যাঁদের মুখে হাসি আর মাথায় লম্বা চুল। অন্য দল হলেন সৈনিক সম্প্রদায় যাঁদের পরনে সামরিক জামা কাপড় আর চোখমুখ ভ্রূকুটিকুটিল।

ভদ্রসমাজ থেকে একটু নীচের দিকে নেমে এসে একটু ভিন্ন বিষয় নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম। ইহুদী ফিরিওলাদের দেখলাম আমি। ওদের বাজের মত তীক্ষ্ণ চোখজোড়া ছাড়া আকৃতির মধ্যে হীনমন্যতার ছাপ ছিল স্পষ্ট। দেখলাম শক্ত সমর্থ পেশাদার ভিখিরিদের। জীবন সম্পর্কে হতাশা নিয়ে ওরা রাত্রে ভিক্ষে চেয়ে বেড়াচ্ছে আর সাধুসন্ন্যাসী দেখলে তাদের কাছে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ভিক্ষে চাইছে। ক্ষীণপ্রাণ বিকৃতদর্শন বিকলাঙ্গদের দেখতে পেলাম আমি। নিশ্চিত মৃত্যু ওদের ওপর যেন ছায়া বিস্তার করে রেখেছে। ওরা পথের পাশ দিয়ে কম্পিত পদক্ষেপে এগোবার চেষ্টা করছিল আর কিছু আশা আর সান্ত্বনা লাভের উদ্দেশ্যে জনতার প্রতিটি লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। দেখলাম, কর্মক্লান্ত তরুণীদের নিরানন্দ বাড়ীর পথে ফিরে যেতে। ইতর ছেলে-ছোকরাদের চাউনি থেকে অত্যন্ত সন্তর্পণে নিজেদের বাঁচিয়ে নিয়ে চলেছিল ওরা। কখনো কখনো ওদের মুখোমুখী হয়ে পড়তে হচ্ছিল মেয়েদের কিন্তু তা থেকে রেহাই পাবার পথ ছিল না। কিছু ছেঁড়া কাপড়জামা পরা কুষ্ঠরোগীদেরও দেখলাম রাস্তায় আর দেখলাম কুঞ্চিত মুখমণ্ডল কিছু বয়স্কা নারীদের যাঁরা গয়না আর প্রসাধন দ্রব্যের সাহায্য নিয়ে যৌবন ধরে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করছিলেন। চলেছিল কিছু মাতাল। ছেঁড়া জামা কাপড় পরে টলতে টলতে আর বিড় বিড় করে বকতে বকতে ওরা চলেছিল এগিয়ে। ওদেরই একদলকে দেখলাম মোটামুটি ভালো জামা

কাপড় পরা, আজও জামা কাপড়ে বুরুশ দেওয়া হয়েছে তাদের কিন্তু ম্লানমুখ বিভ্রান্তদৃষ্টি রক্তচক্ষু এই মানুষগুলি জনতার ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলবার সময় হাতের নাগালের মধ্যে যা পাচ্ছিল তাই কম্পমান আঙ্গুলে মুঠো করে ধরছিল। এ ছাড়া জনতার সঙ্গে মিশে চলেছিল ক্লান্ত কুলি মজুর, জিনিষপত্রে শানপালিশ দেবার, বাঁদর খেলাবার, গান গেয়ে পয়সা উপার্জন করবার মানুষেরাও। সব মিলিয়ে যে প্রাণবন্যা আর ধ্বনিপ্রবাহ সৃজিত হচ্ছিল তা আমার কানে একটা ছন্দহীন শব্দতরঙ্গ আর চোখে বিসদৃশ দৃশ্যের অবতারণা করছিল।

ক্রমশ রাত গভীর হতে থাকল আর সেই সঙ্গে গভীরতর হয়ে উঠল চলমান দৃশ্যাবলী পর্যবেক্ষণ করবার জন্যে আমার ঔৎসুক্য। এদিকে এই দৃশ্যের পরিবর্তনটিও অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। তার মধ্যেকার ভদ্র আর নিয়মানুগ অংশগুলো অন্তর্হিত হয়ে গিয়ে কুখ্যাত আর অশোভন অংশগুলোই ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছিল। দিনের অপস্রিয়মান আলোর সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে রাস্তার বাতি-গুলো মিট্‌মিট্‌ করছিল। এতক্ষণে ওরা উজ্জ্বলতর হয়ে কুৎসিত দৃশ্যগুলোকেই ঝল্‌মলে করে তুলেছিল।

সেই উজ্জ্বল আলোয় জানালা দিয়ে অল্প যেটুকু সময় দেখবার সুযোগ পাচ্ছিলাম তারই মধ্যে প্রতিটি মুখ আরও খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম আমি। শুধু এক পলক দেখার সুযোগ ছিল আমার তবু মনে হতে লাগল যে ওরই মধ্যে প্রতিটি মুখে বহু বৎসরের ইতিহাস পাঠ করতে পারছিলাম আমি।

জানালার কাচে চোখ ঠেকিয়ে জনতার প্রতিটি মুখ দেখে নিতে আমি যখন যথেষ্ট ব্যস্ত, ঠিক তখনই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল জরাজীর্ণ ষাট বা পঁয়ষট্টি বছর বয়সের একটি মুখ। ঐ মুখটির মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল অথচ সামান্যতম লক্ষণের সঙ্গে আমার পূর্বপরিচিতি ছিলনা। মুখটিকে দেখা মাত্রই মনে হোল রেজ তাঁর বিখ্যাত শয়তানের ছবিটি আঁকবার আগে এই মুখটি অবশ্যই দেখে-ছিলেন। ওই মুখটির প্রাথমিক অর্থ বোঝবার জন্যে যে স্বল্পতম সময়

আমি পেয়েছিলাম তারই মধ্যে আমার মনে বিচিত্র বিপরীত চিন্তার উদয় হোল। মনে হোল ওই মুখের রেখায় রেখায় যে বিরাট মানসিক শক্তির চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তার মধ্যে একাকার হয়ে আছে সাবধানতা আর দৈন্য, শান্তি আর ঘৃণা, প্রতিহিংসা আর সাফল্য, আনন্দ আর অপরিসীম ভীতি আর সেই সঙ্গে নিঃসীম হতাশা। মনে হোল এমন ভয়ঙ্কর আকর্ষণীয় মুখ আমি আর কখনো দেখিনি। 'কী এক আদিম আর অস্বাভাবিক ইতিহাসই না ঐ মানুষটি তার অন্তরে বহন করে চলেছে'—বলে উঠলাম আমি। হঠাৎ মনে হোল এ মানুষটিকে নজরে রাখা দরকার, ওর কথা অনেক বেশী করেই জানা দরকার। তাড়াতাড়ি ছড়ি আর টুপিটা তুলে নিয়ে ওভার কোটটি গায়ে দিয়ে রাস্তায় নেমে গেলাম আর যে দিকে ওই ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন ভিড়ের ভেতর দিয়ে সেদিকে তাড়াতাড়ি এগোতে লাগলাম। একটু পরেই ওঁকে খুঁজে পেলাম আর ওঁর দৃষ্টি আকর্ষণ না করেই ওঁর পিছু নিলাম।

এখন ওঁকে ভাল করেই দেখতে পারলাম আমি। ছোটখাটো চেহারার দুর্বল গড়নের এই মানুষটির পরনে ছিল ময়লা আর ছেঁড়া জামা কাপড়। উজ্জ্বল আলোর তলায় আসা মাত্রই বুঝতে পারলাম জামাকাপড় এককালে তৈরী হয়েছিল দামী কাপড়েই। আর যদি আমার চোখের তীক্ষ্ণতা ঠিক থাকে আর তারা আমাকে প্রতারিত না করে থাকে তাহলে এও দেখলাম যে উনি হীরে ব্যবহার করছেন আর পোশাকের তলায় আছে একটা ছোরা। আমার উৎসাহ বেড়ে গেল, স্থির করলাম যে উনি যেখানেই যান না কেন আমি তাঁকে অনুসরণ করে নেব।

তখন বেশ রাত হয়েছে, সারা শহরের ওপর যে ঘন কুয়াশা জমেছিল তারই পরিণতি তখন ঘটছে বর্ষণে। বর্ষা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে জনতার মধ্যে আলোড়ন লক্ষ্য করা গেল আর পরমুহূর্তেই মানুষের পরিবর্তে দেখা গেল অজস্র ছাতা। জনতার মধ্যে চাঞ্চল্য আর গুঞ্জন তখন দশগুণ বেড়ে গিয়েছে। বর্ষার জন্যে আমার কিন্তু

কোন অসুবিধেই হচ্ছিল না। আমি মুখের ওপর একটা রুমাল জড়িয়ে নিয়ে ভদ্রলোকটিকে পাছে হারিয়ে ফেলি তাই একেবারে তাঁর গা ঘেঁষে হাঁটছিলাম। ভদ্রলোকটি একবারও পেছন ফেরেননি বা আমাকে লক্ষ্য করেননি। কিছুক্ষণ পরে আমরা অন্য এমন একটা রাস্তায় পৌঁছলাম যেখানে লোকজন খুব কম। এখানে পৌঁছেই ওঁর আচরণে পরিবর্তন দেখা গেল। এখন অনেকখানি সঙ্কোচের সঙ্গে ধীর পদক্ষেপে চললেন উনি। কিছুটা লক্ষ্যহীনভাবে রাস্তাটায় এদিক ওদিক পায়চারী করলেন। আমি কিন্তু ওঁর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেই চললাম। অপ্রশস্ত আর দীর্ঘ পথটায় ঘণ্টাখানেক ধরে চললেন তিনি। ইতিমধ্যে পথের লোকজন আরও কমে এসেছে। পার্কের কাছে ব্রডওয়েতে দুপুরবেলা যে রকম লোকজন দেখা যায়, এখন এ রাস্তায় তার চাইতে বেশী লোক ছিল না। লণ্ডনের জনবহুল শহরের সঙ্গে আমেরিকার কোন শহরের এই পার্থক্যটি সহজেই চোখে পড়ে। আর একটা মোড় ফিরে আমরা অন্য একটা আলোকোজ্জ্বল আর জনবহুল রাস্তায় এসে পৌঁছলাম। সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের আচরণে পরিবর্তন এসে গেল। ওঁর চিবুকটা বুকের কাছে নেমে এলো কিন্তু আশপাশে লোকজনের ভিড়ের মধ্যে তাঁর চোখ এদিকে ওদিকে কী যেন খুঁজে বেড়াতে লাগলো। বেশ সাবধানতার সঙ্গে তখনো এগিয়ে চলেছেন তিনি। কিন্তু হঠাৎ একবার পেছন ফিরে কিছুটা উল্টোমুখে হেঁটে গিয়ে তিনি আবার ফিরে এলেন। ওঁকে এই ভাবে কয়েকবার যাতায়াত করতে দেখে খুব বিস্মিত হলাম আমি। মধ্যে একবার আমাকে দেখে ফেলার মতো অবস্থা হয়েছিল।

এইভাবে আরও ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। বৃষ্টি বাড়ার ও ঠাণ্ডা পড়ার ফলে লোকজন এবার বাড়ী ফিরতে আরম্ভ করেছিল তাই পথে লোকজনের দিক থেকে বাধা পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যাচ্ছিল। কিছুটা যেন অসহিষ্ণুতার সঙ্গে পথিকটি অপেক্ষাকৃত নির্জন একটা ছোট রাস্তায় ঢুকে পড়লেন। এই রাস্তায় প্রায় সিকি মাইল পথ উনি যে পরিমাণ দ্রুততার সঙ্গে হেঁটে গেলেন, তার সঙ্গে তাল রেখে

চলা আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠল। তারপর উনি একটি ওঁর অতিপরিচিত বাজারে গিয়ে পৌঁছলেন আর অজস্র ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে আগের মতই এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

এখানেই প্রায় ঘণ্টাদেড়েক কাটল। এর মধ্যে নিজেকে ওঁর নজর থেকে দূরে রাখতে আমাকে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে আমার পায়ে নরম জুতো ছিল আর নিঃশব্দে হাঁটা-ফেরা করতে পারছিলাম আমি। আমি যে ওঁর ওপর নজর রেখে চলেছি একটি মুহূর্তের জন্যেও তিনি তা বুঝতে পারেননি। উনি প্রায় প্রতিটি দোকানে ঢুকলেন আর সব জিনিস খুঁটিয়ে দেখলেন কিন্তু কোন জিনিসেরই দাম জানতে চাইলেন না। ওঁর এই সব আচরণে আমি খুবই বিস্মিত হয়ে উঠেছিলাম। মনে মনে স্থির করে ফেললাম ওঁর সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ না-করা পর্যন্ত আমি ওঁকে নজরে রাখবো।

একটা বড় ঘড়িতে ঢং ঢং করে এগারোটা বাজল। বাজারের লোকজন এবার কমতে শুরু করল। একজন দোকানদার তার দরজা বন্ধ করতে গিয়ে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের গায়ে ধাক্কা খেল। দেখলাম ভদ্রলোক যেন কেঁপে উঠলেন, পরমুহূর্তেই তিনি বড় রাস্তায় পৌঁছে এদিক ওদিক কী যেন দেখে নিয়ে অবিশ্বাস্য গতিতে দৌড়ে চললেন। বহু ছোট ছোট জনশূন্য গলি আর আঁকাবাঁকা রাস্তা পেরিয়ে উনি শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছলেন ডি কফিহাউসের সামনে সেই বড় রাস্তায়। এ রাস্তার চেহারা সেই আগের মতোই ছিল। তখনো বেশ বৃষ্টি পড়ছে। গ্যাসের আলোয় দেখা যাচ্ছিল লোকজনের যাতায়াত অনেক কমে গিয়েছে। ভদ্রলোকের মুখ তখন ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। একদা জনবহুল সেই রাস্তায় কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করার পর আবার কতকগুলো রাস্তা পেরিয়ে নদীর দিকে রওনা হলেন। শেষ পর্যন্ত উনি পৌঁছলেন একটা বড় থিয়েটার হলের সামনে। ওটা তখন বন্ধ হবার মুখে। দরজা দিয়ে লোকজন বেরিয়ে আসছিল। দম নেবার জন্যেই যেন উনি দ্রুতবেগে ঐ জনতার মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালেন।

মনে হচ্ছিল ইতিমধ্যে তাঁর মানসিক উত্তেজনা অনেকখানি কমে এসেছে। মাথা আবার ঝুঁকে পড়ল বুকের দিকে। প্রথম যে অবস্থায় তাঁকে দেখেছিলাম, এখন আবার সেই রকমই মনে হতে লাগল আমার। লোকজন বেশীর ভাগ যেদিকে চলেছিল উনিও সেইপথে এবার এগিয়ে চললেন। ওঁর ব্যবহার ক্রমশ আমার কাছে দুর্বোধ্য হয়ে উঠছিল।

যেতে যেতে আগের অস্থিরতা আর অস্বস্তি যেন আবার ফিরে এলো। দশবারো জনের একদল লোকের পেছনে পেছনে উনি চলছিলেন। কিছুদূর যাবার পর এক একজন কমে গিয়ে দলটিতে রইল মাত্র তিনজন। ওরা তখন চলেছে প্রায় অন্ধকার একটা নির্জন সরু গলি দিয়ে। পথিক একটু থমকে দাঁড়ালেন হঠাৎ। মনে হোল গভীর চিন্তার মধ্যে হারিয়ে গিয়েছেন তিনি, পরক্ষণে আবার দ্রুতবেগে হাঁটতে হাঁটতে শহরের উপকণ্ঠে এমন একটা এলাকায় এসে পৌঁছলেন যেটি এতক্ষণ যে সব এলাকায় আমরা ঘোরাঘুরি করছিলাম তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। চরম দারিদ্র্য আর অপরাধমূলক কাজকর্মের জন্য কুখ্যাত বিশ্রী দুর্গন্ধপূর্ণ লণ্ডনের এই এলাকায় আলোও বেশী ছিল না। মাঝে মধ্যে এক আধটা আলোয় বড় বড় ঘুনে ধরা নড়বড়ে পুরোনো দিনের কাঠের বাড়ী নজরে পড়ছিল। বাড়ীগুলোর মাঝখান দিয়ে রাস্তাটাও ভালো করে চোখে পড়ছিল না। পাথরগুলো খুলে গিয়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়েছিল আর রাস্তার সেই ফাঁকগুলোতে ঘাস গজিয়ে উঠেছিল। চারদিকে আবর্জনার ভয়ঙ্কর স্তূপ। এলাকাটাকে ভীষণ নির্জন মনে হচ্ছিল। যাই হোক কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে তারপর মানুষের সাড়া পাওয়া গেল। লণ্ডন শহর থেকে বহিষ্কৃত জনসমষ্টির একটা অংশকে ঘোরা ফেরা করতে দেখা গেল। নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের মত ভদ্রলোকের প্রাণশক্তি যেন শেষবারের মত উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। আবার তিনি এগিয়ে চললেন, একটা মোড় ফিরেই পৌঁছলেন শহরতলীর কুখ্যাত মদচোলাইয়ের ভাঁটিগুলোর সামনে। সুরাসক্তির সেই প্রাসাদগুলির সামনে গিয়ে আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম।

তখন ভোর হয়ে আসছিল। হতচ্ছাড়া মাতালরা তখনো ভাঁটিখানার মধ্যে যাতায়াত করছিল। ভদ্রলোক যেন আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন তারপর সেই মাতালদের দলে ভিড়ে গিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করতে লাগলেন। একটুক্ষণের মধ্যেই যে ভাবে লোকজন বেরুতে লাগল তাতে বোঝা গেল যে সে রাত্রের মত ভাঁটিখানার মালিক তার দোকান বন্ধ করছে। ভদ্রলোকটির মুখের ওপর দীর্ঘসময় ধরে লক্ষ্য করে চলেছিলাম। এখন মনে হোল হতাশ না হয়ে উনি যেন বড় বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। পাগলের মত আবার ফিরে চললেন তিনি লণ্ডন শহরের দিকে। বেশ দ্রুত বেগেই হেঁটে চললেন তিনি আর আমিও চললাম সমান বেগে পূর্বের মত ঔৎসুক্য নিয়ে। সূর্য উঠেছে। উনিও এগিয়ে চলেছেন। একটু পরে আবার সেই ডি---কফিহাউসের সামনের রাস্তায় তিনি গিয়ে পৌঁছলেন। আগের দিন সন্ধ্যায় যে ভাবে লোকজনের ভিড় দেখেছিলেন তখন প্রায় সেইরকম ভিড় শুরু হয়ে গিয়েছে। আগের মতই ভদ্রলোক হাঁটতেই থাকলেন, এদিক ওদিক একেবারে লক্ষ্যহীন ভাবে। সারাদিন ধরে যাত্রীমুখর পথেই হাঁটতে থাকলেন তিনি। আবার যখন সন্ধ্যা হয় হয় তখন ক্লান্তিতে আমি একেবারে ভেঙে পড়ছিলাম। আমি সামনে এসে ওঁর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। উনি কিন্তু থামলেন না, এগিয়ে চললেন। আমি থেমে গিয়ে চিন্তা করতে শুরু করলাম। মনে মনে বললাম, এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি অপরাধমূলক কাজকর্মের জীবন্ত প্রতীক। উনি কখনো একা থাকতে পারতেন না তাই জনতার মানুষ হয়ে গিয়েছেন তিনি। ভগবানের এইটুকু আশীর্বাদ উনি লাভ করেছেন যে জনতার মধ্যে মিশে থেকে উনি কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করতে পারেন।

চারকোণা বাক্স

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। আমি নিউ-ইয়র্ক যাবার জন্য চার্লেস্টন থেকে ক্যাপ্টেন হার্ডির 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স' জাহাজে টিকিট কেটেছি। আবহাওয়া ভালো থাকলে জুনের পনেরো তারিখে আমাদের রওনা হবার কথা তাই চোদ্দ তারিখেই আমি জাহাজে গেলাম কতকগুলো ব্যবস্থা পাকা করে নেবার জন্যে। গিয়ে দেখি জাহাজের যাত্রী অনেক আর মহিলা যাত্রীর সংখ্যা একটু অস্বাভাবিক রকমের বেশী। তালিকায় অনেকগুলি পরিচিত নাম দেখে খুশী হলাম। বিশেষ করে মিঃ কর্ণেলিয়াস ওয়াটের নাম দেখে খুব ভালো লাগল। এই তরুণ চিত্রকরটি ছিলেন আমার প্রিয় বন্ধু। একসময় বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা একত্রে থেকেছি আর লেখাপড়া করেছি। উনি প্রতিভাবান ব্যক্তি, ওঁর চরিত্রের মধ্যে একই কালে কিন্তু উৎসাহ, সংবেদনশীলতা আর মনুষ্যদ্বেষিতা দেখেছি। এ সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার। এ ধরনের মানুষ খুব অল্পই দেখা যায়।

তালিকায় দেখলাম উনি নিজের, স্ত্রীর আর দুই বোনের টিকিট কেটেছেন। ওঁর নাম তিনখানা কামরার গায়ে লাগানো আছে দেখা গেল। কামরাগুলো বেশ বড়, প্রত্যেকটাতে একটার ওপর আর একটা এই ভাবে দুটো করে শোবার জায়গা আছে। শোবার জায়গাগুলো এত ছোট নয় যাতে একজন শুতে পারেনা, তবুও চার জনের জন্য তিনখানা কামরা ভাড়া যে কেন করা হয়েছিল বুঝতে পারলাম না। ঐ সময়টাতে নিতান্ত ছোটখাট জিনিস নিয়েও আমি বড় বেশী কৌতূহলী হয়ে উঠতাম। আমার স্বীকার করতে লজ্জা হচ্ছে যে জাহাজের কামরার সংখ্যা নিয়ে আমি অযৌক্তিক আর বিশ্রী কতকগুলো অনুমান করতে শুরু করেছিলাম। এ নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজনীয়তাই আমার ছিলনা তবু এই

সমস্যার সমাধান খুঁজে বার করবার জন্যে আমি তৎপর হয়ে উঠলাম। শেষে যখন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম তখন মনে হোল এই সমাধানে আমার অনেক আগেই পৌঁছনো উচিত ছিল। একটা কামরা নিশ্চয় চাকরের জন্য নেওয়া হয়েছে, বোকার মত এই সাধারণ কথাটা আমি আগে ভাবিনি। যাত্রীদের তালিকাটি আবার খুঁটিয়ে দেখলাম কিন্তু তাতে চাকরের উল্লেখ দেখলাম না। কিন্তু এটাও ঠিক যে ওঁরা সঙ্গে চাকর আনার সিদ্ধান্ত গোড়ায় নিয়েছিলেন। তালিকায় চাকরের নাম লিখে পরে তা কেটে দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই সঙ্গে কিছু বেশী মালপত্র আছে। আমার মনে হোল, ওঁর সঙ্গে এমন কিছু জিনিস অবশ্যই আছে যেগুলোকে উনি নিজের নজরে রাখতে চান। হতে পারে কিছু মূল্যবান ছবিই সঙ্গে আছে, ইতালীয় ইহুদী নিকোলিনোর সঙ্গে এই ছবি নিয়েই দরদস্তুর চলেছে হয়ত। যাই হোক এই কথাগুলো মনে হবার পর আমার সমস্ত কৌতূহল তিরোহিত হোল।

ওয়াটের হু'টি বোনকেই আমি জানতাম। ওরা বেশ বুদ্ধিমতী আর ভদ্র। ওয়াট সম্প্রতি বিয়ে করেছিলেন তাই তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয়ের কোন সুযোগ আমার হয়নি। ওঁকে অবশ্য ওঁর স্ত্রী সম্বন্ধে খুব উৎসাহিত ভাবেই আমার সামনে আলোচনা করতে দেখেছি। উনি নাকি খুবই সুন্দরী, বুদ্ধিমতী আর মার্জিতরুচিসম্পন্না। ওঁর সঙ্গে তাই পরিচয়ের জন্যে আমার খুব আগ্রহ ছিল।

যে চোদ্দ তারিখে আমি জাহাজে সব বিলিব্যবস্থা দেখতে গিয়েছিলাম সেদিন মিঃ ওয়াটদেরও আসার কথা বলে ক্যাপ্টেনের কাছে শুনলাম। আমার তাড়াতাড়ি ফিরে আসার কথা ছিল কিন্তু মিসেস ওয়াটের সঙ্গে পরিচয় হবে এই আশায় এক ঘণ্টারও বেশী সময় ওখানে অপেক্ষা করলাম। শেষ পর্যন্ত তিনি এলেন না। কৈফিয়ৎ শোনা গেল, তাঁর শরীর সুস্থ নয়। আগামী কাল জাহাজ ছাড়ার সময় তিনি এসে পৌঁছবেন।

পরের দিন হোটেল থেকে জাহাজ ঘাটে যাবার জন্যে প্রস্তুত

হচ্ছি এমন সময় ক্যাপ্টেন হার্ডি এসে হাজির। তিনি বললেন, 'বিশেষ কারণে' (কথাগুলো একদম বাজে। লোকে সুবিধেমত ব্যবহার করে এগুলোকে!) 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স' দিন দুই যাত্রা স্থগিত রাখছে। সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেলে ওঁরা আমাদের খবর দিয়ে যাবেন। 'বিশেষ কারণ' কথাটায় আমার ভীষণ বিরক্তি বোধ হোল। দক্ষিণের বাতাস বইছিল। আবহাওয়া সুন্দরই ছিল। তবু আমার কিন্তু কিছুই করার ছিল না তাই বাড়ী ফিরে বিরক্তি আর অধৈর্য মানসিক অবস্থাটাকে একান্তে শান্ত করে তুললাম।

প্রায় এক সপ্তাহ ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে কোন খবর এলো না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত খবর এসে পৌঁছল আর সঙ্গে সঙ্গেই আমি রওনা হয়ে গেলাম। জাহাজের ওপর তখন বেশ ভীড়। জাহাজ ছাড়বে তার জন্য সব দিকেই ব্যস্ততা। আমার পৌঁছনোর প্রায় মিনিট দশেক পরে মিঃ ওয়াট তাঁর লোকজন নিয়ে পৌঁছলেন। সঙ্গে ছিল দু' বোন আর স্ত্রী। তাঁর কিন্তু মেজাজের মধ্যে সেই অসামাজিক ভঙ্গীটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যাকে আমি মানবদ্বেষিতা বলেই অভিহিত করেছি। এ সব অবস্থার সঙ্গে আমার পরিচয় কম ছিল না তাই আমিও মোটেই মনোযোগ দিলাম না। উনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন না। ওঁর বোন মেরিয়ান বেশ বুদ্ধিমতী আর মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে। দায়িত্বটা শেষ পর্যন্ত ওই গ্রহণ করল। অল্প কয়েকটা কথা বলে তাড়াতাড়ি পরিচয়ের পর্ব চুকিয়ে ফেলল সে।

মিসেস ওয়াট ওড়নায় মুখ ঢেকে রেখেছিলেন। আমার স্বীকার করতে বাধা নেই যে আমার নমস্কারের প্রতি-নমস্কার জানাতে গিয়ে উনি ওড়নাটা তুলতেই আমি ভীষণ বিস্মিত হলাম। বন্ধুর আগ্রহের অতিশয্যে চিত্রকর-সুলভ বর্ণনার অতিরঞ্জন সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাই ছিল আমার তাই এ ক্ষেত্রে আমার বিস্ময়ের পরিমাণ বরং কমই হয়েছিল বলা চলে। বিষয় বস্তু যদি সৌন্দর্যসম্পর্কিত হয় তাহলে কল্পনার আবেগে তিনি কতখানি তাকে আদর্শায়িত করতে পারেন তা আমার জানা ছিল।

সত্যি কথা বলতে কি মিসেস ওয়াটকে আমি সুন্দরী ভাবতেই পারলাম না। তিনি কুৎসিত না হলেও তারই কাছাকাছি বলা যায় তাঁর রূপকে। পোষাক পরিচ্ছদ ছিল অবশ্য অত্যন্ত উঁচু স্তরের। আমার এই ধারণাই হল যে এই মহিলাটি তাঁর সদ্‌গুণাবলী আর বুদ্ধিমত্তার সাহায্যেই আমার বন্ধুর হৃদয় জয় করে থাকবেন। অল্প কয়েকটা কথা বলে উনি মিঃ ওয়াটের সঙ্গে তাঁর কামরায় চলে গেলেন।

আমার সেই চিরন্তন কৌতূহল ততক্ষণে ফিরে এসেছে। আমি নিশ্চিত হলাম যে ওঁদের সঙ্গে চাকর নেই। এবার তাঁর বাড়তি জিনিস পত্রের খোঁজ নিলাম। কিছুক্ষণ পরে একটা ঠেলা গাড়ীতে কাঠের একটা চারকোনা বাক্স এলো। বেশ বুঝলাম ঐটি ছাড়া ওঁদের আর কোন জিনিস আসার ছিল না। যাই হোক এর পরই জাহাজ ছেড়ে দিল আর অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা বারদরিয়ায় গিয়ে পৌঁছলাম।

কাঠের বাক্সটা ছিল প্রায় ছ'ফুট লম্বা আর আড়াই ফুট চওড়া। ওটাকেই আমি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলাম। ওটার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে মনে হোল আমার। আমার অনুমানের মধ্যে কোন ত্রুটি ছিল না। এবার মনে হোল বন্ধুর বাড়তি এই বাক্সটির মধ্যে একটা বা অনেকগুলো ছবি আছে। আমি জানতাম, কয়েক সপ্তাহ ধরে বন্ধুটি নিকোলিনোর সঙ্গে কি সব আলোচনা করছিলেন। এ বাক্সটা দেখে তাই মনে হয় এতে লিওনার্দোর লাস্ট সাপার ছবির প্রতিলিপি আছে। আমি জানি ফ্লোরেন্সের ছোট-রুবিনির আঁকা এমনি একটা প্রতিলিপি দীর্ঘদিন নিকোলিনোর কাছে ছিল। এ বিষয়ে তাই আমার কোন সন্দেহই রইল না। নিজের সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধির ওপর বেশ খানিকটা শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। কিন্তু এত বড় একটা শিল্পকর্ম সম্পর্কে ওয়াট আমাকে কিছুই জানাতে চাননা কেন? নিশ্চয় আমার অজ্ঞাতসারেই বস্তুটাকে গুপ্তভাবে নিউইয়র্কে পাচার করতে চান। আমিও স্থির করলাম এ নিয়ে বেশ মজা করব ওঁর সঙ্গে

একটা ব্যাপার লক্ষ করে খুব বিরক্ত বোধ করলাম। বাক্সটাকে ওঁরা বাড়তি কামরায় না পাঠিয়ে নিজের কামরায় রাখলেন। ওটা ঘরের পুরো মেঝে দখল করে রইল আর বলাই বাহুল্য যে এতে মিঃ ওয়াট আর তাঁর স্ত্রী উভয়ের অবশ্যই অসুবিধে হচ্ছিল। তাছাড়া বাক্সটার ওপর যে রঙ দিয়ে বড় বড় হরফে ঠিকানা লেখা হয়েছিল তা থেকে বিশ্রী এক ধরনের গন্ধও বেরুচ্ছিল। বাক্সের ঢাকনার ওপর লেখা ছিল,—'মিসেস এডেলাইড কার্টিস, আলবানি, নিউইয়র্ক। প্রেরক—মিঃ কর্ণেলিয়াস ওয়াট। এই দিকটি উপরে রাখুন। সাবধানে নড়াবেন।' এখন বুঝলাম ঐ মিসেস এডেলাইড কার্টিস মিঃ ওয়াটের শাশুড়ী। কিন্তু ঠিকানাটায় যেন একটা রহস্যের গন্ধ পেলাম। আমি জানতাম যে ওই বাক্স বন্ধুর নিউইয়র্ক শহরে চেম্বার্স স্ট্রীটে যে ষ্টুডিও আছে তা থেকে উত্তর দিকে কখনোই যাবে না।

প্রথম তিন চার দিনে আমরা উপকূল ছাড়িয়ে সমুদ্রের মধ্যে অনেকখানি উত্তর দিকে অগ্রসর হয়েছিলাম। আবহাওয়াও বেশ শান্ত ছিল তখন।

জাহাজের আরোহীদের মন মেজাজ তখন বেশ ভালোই ছিল আর সবাই সবার সঙ্গে বেশ সামাজিক ব্যবহার করে চলেছিল। কিন্তু এ কথা দৃঢ়তার সঙ্গেই বলব যে মিঃ ওয়াট আর তাঁর বোনেরা মোটেই ভালো ব্যবহার করছিলেন না। বরং বলব ওঁরা যাত্রীদের সঙ্গে অভদ্র আচরণই করছিলেন। ওয়াটের ব্যবহারের জন্য আমার কোন মাথাব্যথা ছিল না। উনি মুখ গোমড়া করেই ছিলেন আর ঐটেই তাঁর স্বভাব। অবশ্য এ ক্ষেত্রে ওঁর বিষণ্ণতাকে আমি বিশেষ চারিত্রিক লক্ষণ হিসেবেই গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু তাঁর বোনদের আমি ক্ষমা করতে পারছিলাম না। অধিকাংশ সময়ই ওরা ওদের ঘরের মধ্যে থাকছিল। আমি বহুবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও কোন যাত্রীর সঙ্গে মেলামেশায় ওরা রাজী হয়নি।

মিসেস ওয়াটের ব্যবহার কিন্তু খুবই সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল। উনি সকলেরই সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। মাঝ-দরিয়ায় এইভাবে

সকলের সঙ্গে কথাবার্তা চালানোর মূল্য অনেকখানি। আমার মনে হোল উনি নারী আর পুরুষদের সঙ্গে বেশ হৃদ্যতার সঙ্গেই মিশছিলেন। খুব আনন্দ দিচ্ছিলেন তিনি সবাইকে। হ্যাঁ, আনন্দ দিচ্ছিলেন বলা ছাড়া আর কীইবা বলতে পারি। আমি আবিষ্কার করলাম তাঁকে নিয়ে হাসিঠাট্টা হচ্ছে না বরং সব হাসিঠাট্টায় তিনি খোলাখুলি ভাবে যোগ দিচ্ছেন। পুরুষেরা ওঁর সম্পর্কে প্রায় নীরবই ছিলেন কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই নারীরা ঘোষণা করলেন যে মহিলাটি দেখতে সুন্দরী ত নয়ই, তিনি অশিক্ষিতা আর আন্তরিকতা থাকলেও রুচির দিক থেকে অত্যন্ত অমার্জিত। এই মহিলা কী ভাবে ওয়াটকে ফাঁদে ফেললেন আর বিয়েতে রাজী করালেন সেইটি আমার কাছে একটা রহস্য হয়ে দাঁড়ালো। অর্থ অবশ্যই একটা সাধারণ সমাধান-সূত্র। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা হয়নি কেননা মিঃ ওয়াট আমাকে আগেই বলেছেন যে উনি সঙ্গে করে একটা ডলারও আনেন নি বা ভবিষ্যতে যে কোথাও থেকে কিছু পাওয়া যাবে এমন সম্ভাবনার পথও দেখান নি। ওয়াট বলেছিলেন যে শুধু ভালোবেসেই নাকি উনি এঁকে বিয়ে করেছেন আর সেদিক থেকে ইনি অতুলনীয়া। বন্ধুর কাছ থেকে শোনা এই সব কথা যখন মনে পড়ল তখন আগাগোড়া ব্যাপারটাই আমার কাছে পরম রহস্যময় হয়ে উঠল। তবে কি ভদ্রমহিলার সংস্পর্শে আসার সময় ওঁর ইন্দ্রিয়গুলো ক্রিয়াশীল ছিল না। যে মানুষ এতখানি মার্জিতরুচিসম্পন্ন, বুদ্ধিমান, বিচারশীল, সৌন্দর্য সম্পর্কে এত বেশী সচেতন মানুষের পক্ষে বিশেষ করে ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে এমন অসহিষ্ণু মানুষের পক্ষে এ কী করে সম্ভব! তবে এ কথা ঠিক যে ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীকে ভীষণ ভালোবাসতেন। স্বামীর অনুপস্থিতিতে এই ভালোবাসা বড় বেশী পরিমাণেই প্রকাশিত হোত। সে সময় উনি কথাবার্তার মধ্যে প্রায়ই স্বামীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলতেন, 'আমার প্রিয়তম স্বামী মিঃ ওয়াট কিন্তু এই রকমই বলেন।' স্বামী শব্দটা তো তাঁর 'জিভের ডগায় লেগেই থাকত'। বলা বাহুল্য এই উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে উল্লিখিত কথাগুলোও

তাঁরই। জাহাজের সব যাত্রীই কিন্তু এটা লক্ষ্য করেছিলেন যে মিঃ ওয়াট কিন্তু স্ত্রীকে বেশ এড়িয়ে চলছেন। স্ত্রীকে অবাধে সকলের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ দিয়ে উনি ওঁর কামরার মধ্যে অধিকাংশ সময় একাই কাটিয়ে দিচ্ছিলেন।

আমার পক্ষে যা কিছু দেখা আর শোনা সম্ভব হয়েছিল তা থেকে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হলাম যে ভদ্রলোক নিয়তির পরিহাসে বা সাময়িক উত্তেজনার বশে বা উৎসাহের আতিশয্যে ওঁর চাইতে সব দিক থেকে নিম্নশ্রেণীর একজন মহিলাকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছেন। এর স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে ওঁর মনে অতি দ্রুত এক ধরণের ঘৃণা সৃজিত হয়েছে। ওঁর সম্পর্কে আমার মনে করুণার সৃষ্টি হোল ঠিকই কিন্তু পরমুহূর্তেই ঐ 'লাস্ট সাপার' ছবি নিয়ে যে গোপনীয়তা উনি রক্ষা করছিলেন তার জন্যে নির্মম হয়ে উঠলাম। এর জন্যে প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছাটাই দৃঢ় হোল শেষ পর্যন্ত।

একদিন তিনি ডেকের ওপর বেরিয়ে এসেছিলেন আর অভ্যাস মতো তাঁর হাত ধরে এদিক ওদিক পায়চারী করছিলাম আমি। তাঁর স্বাভাবিক বিষণ্ণভাবটি কিন্তু বজায় ছিল। উনি যেন বেশ চেষ্টা করেই মাঝে মধ্যে একটুখানি কথা বলছিলেন। দু' একবার ওঁর সঙ্গে রসিকতা করার চেষ্টা করলাম কিন্তু তার পরিবর্তে ওঁর হাসিকে বড় বেশী করুণ মনে হোল। হতভাগ্য ওয়াটের স্ত্রীর কথা মনে পড়তে এ বিশ্বাসটিই দৃঢ় হোল যে বন্ধুর পক্ষে কোন আনন্দের ভান করাও সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত আমি নিজের কাজ শুরু করলাম। প্রসঙ্গক্রমে ঐ চারকোনা বাক্সটা সম্পর্কে দু'একবার ইঙ্গিত করলাম। ওঁকে পাকেচক্রে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম যে এ ব্যাপারে তিনি যে একটা রহস্য রেখে দেবেন, তা আমি হতে দিতে চাইনে। আসলে কয়েকটা তীক্ষ্ণ আক্রমণই চালালাম ওঁর ওপর যদিও সবই খুব অপ্রত্যক্ষভাবে। ওঁর সেই চারকোনা বাক্সটার প্রসঙ্গ তুলে বললাম যে তার অদ্ভুত আকৃতি আমাকে আকৃষ্ট করেছে। কথা বলতে গিয়ে আমি একটু সবজান্তার ভাব দেখিয়ে

হাসলাম এমন কি আমার তর্জনী ওঁর বুকে ঠেকিয়ে একটা গভীর ইঙ্গিতও করলাম।

ওয়াট কিন্তু যেভাবে আমার সমস্ত নির্দোষ পরিহাস হজম করে ফেললেন তাতে বুঝলাম উনি পুরোপুরি উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন। প্রথমটা উনি এমন ভাবে আমার দিকে তাকালেন যেন পরিহাসের কোন অর্থই উনি বুঝতে পারছেন না। তার পর যখন কিছুটা অর্থবোধ হোল, তখনো আগের মতোই বড়ো বড়ো চোখ করে তাকিয়ে রইলেন। এর পর ওঁর মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল আবার পরক্ষণেই ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন তিনি। আবার এর পরমুহূর্তেই আমার রসিকতা বুঝে ফেলেছেন এই রকম ভঙ্গীতে হো হো করে হেসে উঠলেন। আমার পক্ষে অবাক হবারই কথা, উনি প্রায় মিনিট দশেক বা তারও বেশী সময় ওইভাবে হাসতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত হাসতে হাসতে উনি জাহাজের পাটাতনের ওপর আছাড় পড়ে গেলেন। ওঁকে তাড়াতাড়ি তুলে ধরতে গিয়ে দেখলাম ওঁর সমস্ত শরীরে মৃত্যুর লক্ষণ পরিস্ফুট।

অনেকেই আমাদের সাহায্যের জন্য দৌড়ে এলেন। কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর তাঁর চেতনা ফিরে এলো। জ্ঞান ফেরার পরও বেশ কিছুক্ষণ তিনি এলোমেলো কথা বলতে থাকলেন। যাই হোক আমরা তাঁর কামরায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলাম। পরদিন সকালে তাঁকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখা গেল। অন্তত শরীরের দিক থেকে কোন রকমের অসুস্থতা তখন আর ছিল না। তাঁর মনের খবর নিইনি। জাহাজে থাকার বাকী ক'দিন আমি তাঁকে এড়িয়ে চলেছি। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে এ ব্যাপারে আমার মতৈক্য ঘটেছিল। তাঁর অনুরোধ মতোই আমি মিঃ ওয়াটের সঙ্গে মেলামেশা করিনি আর তাঁর মানসিক অবস্থা সম্পর্কে জাহাজের অন্য কোন যাত্রীর সঙ্গে কোন রকমের আলোচনাও করিনি।

মিঃ ওয়াটের এই অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেল আর আমার মনের মধ্যে যে কৌতূহল স্তিমিত হয়ে

এসেছিল তা আবার উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। আমি বেশ উত্তেজিত বোধ করছিলাম তাই বেশ কয়েক কাপ চা খেয়ে ফেললাম। এর ফলে দু'রাত্রি আমার একেবারেই ঘুম হোল না। আমার কামরার দরজা খুলে খাবার ঘরে যাওয়া যেত। প্রকৃত পক্ষে একক যাত্রীর জন্যে নির্দিষ্ট সব কামরারই ঐ এক ব্যবস্থা ছিল। মিঃ ওয়াটের কামরাগুলো ছিল অন্য দিকে। ও ঘরগুলোর একটা ছোট দরজা খুলে খাবার ঘরে আসা যেত। ওদের সেই দরজাগুলোকে রাত্রেও তালা দিয়ে রাখা হোত না। আমরা সমুদ্রে বাতাসের যথেষ্ট আনুকূল্য পেয়েছিলাম। এর ফলে জাহাজটা যখনই বাতাসের দিকে মুখ করে দক্ষিণদিকে মোড় নিচ্ছিল তখনই ঐ ছোট দরজাগুলো খুলে যাচ্ছিল। কোন যাত্রী তার বিছানা থেকে উঠে গিয়ে দরজাগুলো বন্ধ করার কষ্টটুকুও স্বীকার করতে রাজী ছিলনা। তাই দরজাগুলো খোলাই থেকে যাচ্ছিল। এদিকে গরমের জন্য আমি আমার কামরার দরজা খোলাই রেখেছিলাম। এর ফলে ওদিকের ছোট দরজা দিয়ে অন্য কামরাগুলোর বিশেষ করে মিঃ ওয়াটের কামরাটার ভেতরটা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলাম। যে দু' রাত্রি আমার ঘুম হয়নি (পরপর দু'রাত্রি নয় কিন্তু) সে দু'টি রাত্রেই দেখলাম রাত এগারোটা নাগাদ মিসেস ওয়াট খুব সাবধানে ওঁদের কামরা থেকে বেরিয়ে ওই বাড়তি কামরাটায় গিয়ে ঢুকছেন আর ভোর পর্যন্ত ওখানেই থাকছেন। ভোরে তাঁর স্বামী ডাকলে তিনি কামরায় ফিরে আসছেন। ওঁরা যে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। পাকাপোক্ত ভাবে বিবাহবিচ্ছেদ করে নেবার আগে ওঁরা বাড়ীতেও নিশ্চয় পৃথক ঘর ব্যবহার করছিলেন। এখানে একটা বাড়তি কামরা ভাড়া করার রহস্যটা এতদিনে স্পষ্ট হয়ে গেল।

আরও একটা ঘটনায় আমি কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। নিদ্রাহীন ঐ দু'টো রাত্রে মিসেস ওয়াট অন্য কামরায় চলে যাবার পর ওঁর স্বামীর কামরায় খুব সাবধানী চাপা কণ্ঠস্বর শুনলাম আমি। খুব মনোযোগ দিয়ে শোনার পর ওর অর্থবোধ হোল একেবারে নির্ভুল

ভাবেই। শিল্পী ভদ্রলোক ছেনী আর হাতুড়ী দিয়ে ওঁর চারকোনা বাক্সটি খোলার চেষ্টা করছিলেন অথচ হাতুড়ীর আঘাত পড়ছিল এমন সব জায়গায় যেগুলো সুতী বা পশমী কোন বস্তু দিয়ে ঢাকা ছিল।

আমি বেশ অনুভব করতে পারছিলাম যে কোন এক সময় বাক্সের ঢাকনাটি খোলা হয়ে গেল এবং মেঝেতে রাখার জায়গা ছিলনা তাই ওটাকে রাখা হোল নীচের শোবার জায়গাটায়। খুব সাবধানে রাখার চেষ্টা করা হলেও কাঠের শব্দ বেশ পেয়েছিলাম আমি। এর পর কামরার মধ্যে নেমে আসতো নিশ্ছিদ্র নীরবতা আর ভোর পর্যন্ত সেই পরিবেশই বজায় থাকত। ভোরে কিন্তু চাপা গলায় ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ আর ফিস্ ফিস্ করে কথা বলার আওয়াজ শুনেছিলাম। অবশ্য জানিনে এগুলো আমারই মনের মধ্যে তৈরী হচ্ছিল কিনা। হয়ত ওঁর কামরা থেকে ফুঁপিয়ে কান্না বা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ সত্যিকারের কোনটিই আমি শুনিনি। শিল্পী হয়ত তাঁর কাঠের সেই চারকোনা বাক্সটা খুলে অমূল্য আর অপূর্ব শিল্পকৃতির আস্বাদই প্রাণভরে গ্রহণ করছিলেন। এর মধ্যে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠবার মত বোধ হয় কিছুই ছিল না। তাই আমি আবার বলছি যে এটা খুবই স্বাভাবিক যে ক্যাপ্টেন হার্ডির কাছে বেশ কয়েকবার চা খাওয়ার ফলে এ সবই আমার উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রসূত। সেই দু' রাত্রির শেষে ভোরের দিকে বাক্সের ঢাকনা বন্ধ করার শব্দ শুনেছি, পেরেকের ওপর সাবধানে হাতুড়ী পেটানোর আওয়াজও পেয়েছি। তার পর পোষাক বদলে তিনি বাড়তি কামরাটা থেকে মিসেস ওয়াটকে ডেকে আনতে যেতেন।

সাতদিন সমুদ্র যাত্রার পর আমরা যখন কেপ হটেরাজ পেরিয়ে গিয়েছি ঠিক তখনই দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে প্রচণ্ড বাতাস বইতে আরম্ভ করল। এ ধরণের ভয় একটা ছিল কারণ কয়েকদিন ধরেই তার পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছিল। যাই হোক এর জন্য যতখানি সাবধানতা নেবার তা নেওয়া হোল। জাহাজটি তার সমুদ্রযাত্রার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকল। প্রায় আট-

চল্লিশ ঘণ্টার শেষের দিকটায় আমরা যে প্রবল ঝড়ের সম্মুখীন হয়েছিলাম তাতে জাহাজের প্রভূত ক্ষতি হয়েছিল আর তিন জন মাল্লা প্রাণ হারিয়েছিল। একটা মাস্তুল ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। ঝড় পুরো থেমে যাবার লক্ষণ দেখা গেল না। তৃতীয় দিনে আর একটা মাস্তুলের ক্ষতি হোল। আমরা যখন ওটাকে নিয়ে ব্যস্ত তখন খবর এলো জাহাজের খোলে চার ফুটের মতো জল জমে গিয়েছে। সমস্যাটা গুরুতর হয়ে দাঁড়ালো যখন দেখা গেল যে জল সেচের পাম্পগুলো প্রায় অকেজো হয়ে রয়েছে।

আমরা যখন এইভাবে প্রচণ্ড হতাশা বিমূঢ়তার মধ্যে রয়েছি তখনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হোল ভারি জিনিষপত্র ফেলে দিয়ে জাহাজটাকে যতদূর সম্ভব হালকা করে ফেলা হবে, এমন কি বাকী দুটো মাস্তুলও কেটে ফেলা হবে। এ সব কাজ করার পরও দেখা গেল অবস্থার এমন কিছু উন্নতি হয়নি। পাম্পগুলো তখনো অকেজো অথচ ওদিকে খোলের ছিদ্রটার আয়তন বেড়ে চলেছিল। সূর্যাস্তের সময় হাওয়ার তীব্রতা আর সেই সঙ্গে সমুদ্রের উন্মত্ততা অনেকখানি কমে গেল। আশা হোল আমরা বোধহয় এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেলাম। রাত আটটা নাগাদ বাতাস থেমে গেল আর মেঘের ফাঁক দিয়ে আকাশে পূর্ণচন্দ্র দেখা গেল। এতে আমাদের হতাশার ভাব অনেকখানি দূর হয়ে গেল।

অমানুষিক পরিশ্রমের পর আমরা প্রথম ছোট নৌকোখানা জাহাজের পাশ থেকে জলে নামাতে পারলাম। ঝড়ে ওটার বড় একটা ক্ষতি করে নি। ওর মধ্যে সমস্ত মাঝিমাল্লা আর অধিকাংশ যাত্রীকে তুলে দেওয়া হোল। নৌকোটা তক্ষুনি রওনা হয়ে গেল আর তিন দিনের দিন ওক্রাকোকে গিয়ে পৌঁছল নিরাপদেই।

এদিকে ভাঙা জাহাজে আমরা ছিলাম চৌদ্দ জন যাত্রী আর ক্যাপ্টেন। আমাদের ভরসা ছিল আর একটা ছোট নৌকোর ওপর। এবার ওটাকে জলে নামানো হোল। অবশ্য নামানোর সময় একটা বিপদ ঘটতে যাচ্ছিল। যাই হোক দৈবানুগ্রহে নৌকোটা

ঠিকমত জলে ভাসল আর ক্যাপ্টেন আর তাঁর স্ত্রী, মিঃ ওয়াটের লোকজন, একজন মেক্সিকান অফিসার আর তাঁর স্ত্রী এবং চারটি ছেলেমেয়ে, আমি ও একজন নিগ্রো—এই কজন সবাই গিয়ে ওটাতে উঠলাম।

কিছু খাদ্য ও পানীয়, অত্যাবশ্যকীয় কিছু যন্ত্রপাতি ছাড়া অন্য কিছু জিনিষপত্র সঙ্গে নেবার প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার নৌকোটা জাহাজ থেকে কয়েক হাত এগোতে-না-এগোতেই মিঃ ওয়াট উঠে দাঁড়িয়ে মিঃ হার্ডিকে তাঁর চারকোনা কাঠের বাক্সটা নিয়ে আসবার জন্যে নৌকোটাকে জাহাজের কাছে নিয়ে যেতে বললেন।

কিছু রূঢ়তার সঙ্গেই ক্যাপ্টেন বলে উঠলেন, 'আপনি চুপ করে বসে থাকুন মিঃ ওয়াট। আপনি কি আমাদের নৌকোটা ডুবিয়ে দিতে চান? দেখছেন না, জল এর মাথায় মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে?'

মিঃ ওয়াট তখনো দাঁড়িয়ে। তিনি বলে উঠলেন, 'কিন্তু আমার বাক্সটা? ক্যাপ্টেন হার্ডি, আপনি মানা করতে পারেন না, করা উচিত নয় আপনার। ওটার ওজন এমন কিছু বেশী নয়। না, মোটেই নয়। আপনার জন্মদাত্রী মায়ের নামে আপনার কাছে অনুরোধ করছি, ক্যাপ্টেন, ফিরে চলুন, আমার বাক্সটা নিয়ে আসতে দিন।'

শিল্পীর আবেগকম্পিত অনুরোধ শুনে কয়েক মুহূর্তের জন্য হয়ত বা ক্যাপ্টেন সহানুভূতি অনুভব করেছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি আগের মতোই কঠোর ভাবে বলে উঠলেন, 'মিঃ ওয়াট, আপনি উন্মাদ। আপনার কথা আমি শুনতে চাইনে। আপনি চুপ করে বসে পড়ুন নইলে আমাদের নৌকো ডুবে যাবে। ওঁকে ধরে বসান তো সবাই, আটকে রাখুন ওঁকে। উনি লাফিয়ে পড়বেন মনে হচ্ছে, হ্যাঁ তাই, ঐ যে, গেল—গেল!'

ক্যাপ্টেনের কথা শেষ হতে না হতেই মিঃ ওয়াট সত্যি সত্যিই লাফিয়ে উঠলেন আর অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে জাহাজ থেকে ঝুলতে

থাকা একটা দড়ি ধরে ফেললেন। ওই দড়িটা জাহাজের একটা মোটা শেকলের সঙ্গে বাঁধা ছিল। পর মুহূর্তেই তিনি জাহাজে উঠে গিয়ে তাঁর কামরার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

এদিকে আমাদের ছোট নৌকোটার অবস্থা কাহিল। ওটা সমুদ্রের দয়ার ওপর তখন পুরোপুরি নির্ভরশীল একটা পালকের মতো নগণ্য জিনিসমাত্র। যাই হোক প্রাণপণ চেষ্টা করে আমরা নৌকোটাকে সামলে নিলাম আর বুঝতে পারলাম যে মিঃ ওয়াটের ভাগ্য মন্দ।

জাহাজ থেকে আমাদের নৌকোটার দূরত্ব তখন বেড়েই চলেছে। হঠাৎ দেখা গেল ওটার ডেকের ওপর তাঁর চারকোনা বাক্সটাকে টানতে টানতে এনে দাঁড়িয়েছেন ওয়াট। দূর থেকে জাহাজের পাটাতনের ওপর তাঁর চেহারাটাকে খুব বড় দেখাচ্ছিল। আমাদের বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টির সামনে দেখা গেল উনি তিন ইঞ্চি মোটা একটা দড়ির কয়েকপাক বাক্সটায় দিয়ে নিয়ে তারপর নিজের শরীরেও জড়ালেন সেটা। তারপর মুহূর্তেই বাক্সসহ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ওয়াট আর চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেলেন।

আমাদের কারো মুখে কথা ছিল না। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমরা নৌকোটার মধ্যে বসে থেকে ঠিক যেখানটায় মিঃ ওয়াট ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, সেইদিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। প্রায় ঘণ্টাখানেকের মত সময় নির্বাক অবস্থায় কেটে গেল। শেষ পর্যন্ত সেই কঠোর নীরবতা ভঙ্গ করলাম আমি। বললাম, 'আচ্ছা আপনি লক্ষ্য করেছেন ক্যাপ্টেন, কত দ্রুতবেগে ওয়াট তাঁর বাক্স নিয়ে জলের তলায় ডুবে গেলেন? ব্যাপারটা একটু অসম্ভব মনে হচ্ছে না? বাক্সের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে নিয়ে উনি যখন ঝাঁপিয়ে পড়লেন, তখন কিন্তু আমি আশা করেছিলাম অন্য রকম।'

ক্যাপ্টেন উত্তর দিলেন, 'উনি ডুবে গেলেন অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই। প্রায় একটা ভারী গোলার মত। তবে উনি আবার ভেসে উঠবেন---কিন্তু যতক্ষণ নুনটা গলে না যাচ্ছে ততক্ষণ নয়।'

'নুন ?'—আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম।

'না, এখন নয়,'—মিঃ ওয়াটের স্ত্রী আর বোনেদের দেখিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন, 'পরে কোন এক সময় এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে।'

খুব বিপদের ভেতর দিয়ে হলেও শেষ পর্যন্ত নিয়তির কৃপায় আমরা তীরে গিয়ে পৌঁছলাম আর আগের নৌকোয় যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলাম। অবশ্য আমাদের অবস্থা মৃতপ্রায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চারদিনের দিন আমরা পৌঁছেছিলাম রোনোক দ্বীপের বিপরীত দিকের তটভূমিতে। এখানে আমরা সবাই ভালো ব্যবহার পেয়েছিলাম। প্রায় সপ্তাহখানেক এখানে কাটিয়ে, আমরা নিউইয়র্ক রওনা হয়ে গেলাম।

'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স' ডুবে যাবার প্রায় একমাস পরে একদিন ব্রডওয়েতে ক্যাপ্টেন হার্ডির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বলা বাহুল্য আমাদের আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ালো জাহাজডুবি আর হতভাগ্য মিঃ ওয়াটের শেষ অবস্থা। ঐ আলোচনাসূত্রেই পুরো খবরটি আমি পেয়েছিলাম।

শিল্পীটি নিজের, স্ত্রীর, দুই বোনের আর একজন চাকরের জন্য জাহাজে জায়গা সংগ্রহ করেছিলেন। আগে যেভাবে বলা হয়েছে ওঁর স্ত্রী ছিলেন অসামান্যা রূপসী। যে চোদ্দ তারিখে আমি প্রথম জাহাজে গিয়েছিলাম সে দিনই ওয়াটের স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন আর মারা যান। যুবক স্বামী প্রায় উন্মাদ হয়ে যান কিন্তু নানা কারণে নিউইয়র্ক যাত্রা করার দিন বেশী পিছোনো সম্ভব হয় নি। মায়ের কাছে স্ত্রীর মৃতদেহটি নিয়ে যাওয়া দরকার অথচ সাধারণ ভাবে তা নিয়ে যাওয়া সংস্কারে বাধে। মৃতদেহ জাহাজে তুললে সব যাত্রীই নেমে পালাবে।

এ সমস্যার সমাধান ক্যাপ্টেন হার্ডিই করেন। উনিই পরামর্শ

দেন যে মৃতদেহটায় ওষুধপত্র মাখিয়ে যথেষ্ট নুনের মধ্যে একটা প্রয়োজনীয় আকারের বাক্সে পুরে, সাধারণ মালপত্র হিসেবে জাহাজে তোলা যেতে পারে। ভদ্রমহিলার মৃত্যু সম্পর্কে কোন কথা বলারই প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু মিসেস ওয়াট হিসেবে কাউকে যাত্রী নেওয়ার প্রয়োজন অবশ্যই ছিল। মৃতা স্ত্রীর পরিচারিকাকে ঐ ভূমিকায় নেওয়া সহজেই সম্ভব হয়েছিল। আগে মিসেস ওয়াটের জীবৎকালে যে কামরাটি এই পরিচারিকার জন্যে ভাড়া করা হয়েছিল সেইটেই তার জন্যে রয়ে গেল। এই পরিচারিকা রাত্রিতে ওই কামরায় ঘুমোতো আর ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই এই তথাকথিত পত্নীটি তার ভূমিকায় যথাযথ ভাবে কর্তব্য পালনের চেষ্টা করত। একটা সুবিধে ছিল এই যে যাত্রীদের কেউই মিসেস ওয়াটকে চিনতেন না।

আমার ত্রুটি সম্পর্কে এবার আমি সচেতন হয়ে উঠলাম। বুঝতে পারলাম যে আমি শুধু অসতর্কই যে হয়েছিলাম তাই নয়, বড় বেশী কৌতূহলী হয়ে অন্ধ আবেগের দ্বারাও পরিচালিত হয়েছিলাম। ইদানীং কিন্তু আমার ঘুম ভালোই হচ্ছে। কখনো কখনো শুধু একটা মুখের ছায়া আমার মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে আর চিরদিনই বোধহয় একটা উন্মত্ত অট্টহাস্য আমি একাই শুনতে পাব।

এ মো ন টি ল্লা ডো র পি পে

ফর্চুনাটো ক্ষতি করেছে আমার অজস্র আর সব কিছু আমি হাসিমুখেই সহ্য করেছি। সে কিন্তু যেদিন আমাকে অপমান করতে সাহসী হয়ে উঠল সেই দিনই প্রতিজ্ঞা করলাম, আমি প্রতিশোধ নেবো। যারা আমাকে ভালো করে চেনে তারা জানে মনের কোন কথাই আমি মুখে প্রকাশ করিনে। যাই হোক প্রতিশোধ যে আমি নেবোই এতে কোন সন্দেহ রইল না যদিও এ ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করতে গেলে যে ঝুঁকির প্রশ্ন আছে তা আমি বিস্মৃত হলাম না। আমার তাই সিদ্ধান্ত ছিল এই যে প্রতিশোধ আমি নেবো কিন্তু তার জন্য কোন শাস্তি আমাকে ভোগ করতে হবে না। প্রতিশোধ যে নিতে চায় সে যদি নিজেই হারিয়ে যায় তা হলে অন্যায়ের প্রতিশোধ নেওয়া হয়ে ওঠে না। তা ছাড়া অন্যায় যে করেছে প্রতিশোধ নেবার বেলায় সে যদি প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তি সামর্থ্য সম্পর্কে অবহিত না হয়, তাহলেও প্রতিশোধস্পৃহা অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।

কথায় বা কাজে ফর্চুনাটোকে আমি এমন কোন সুযোগ কোনদিনই দিই নি যাতে আমার শুভেচ্ছা সম্পর্কে তার সন্দেহ জাগতে পারে। চিরাচরিত অভ্যাসমতোই তার মুখের কথায় হেসেছি আমি। সে বুঝতেও পারেনি যে সে হাসির উৎসমুখ আমার প্রতিশোধস্পৃহার মধ্যেই নিহিত ছিল।

সাধারণভাবে বলতে গেলে ফর্চুনাটোর যে সব গুণাবলী ছিল তার জন্য সে সকলের শ্রদ্ধার এমন কি ভীতির পাত্র হলেও তার একটা দুর্বল দিক ছিল। সে নিজেকে মদ্যরসিক বলে জাহির করত। উচ্চতর দক্ষতা সম্পর্কে এ ধরণের দাবী কম ইতালীয়ই করতে পারেন। ওদের সমস্ত উৎসাহ সময় আর সুযোগ লক্ষ্য করে ব্যয়িত হোত, বিশেষ করে ব্রিটিশ আর অষ্ট্রিয়ান লক্ষপতিদের

প্রতারণা করার বেলায় খুব বেশী পরিমাণে। চিত্রাঙ্কন বা মণি-মাণিক্য সম্পর্কে ফর্চুনাটোর ধারণা নিম্নশ্রেণীর হলেও পুরোনো মদ সম্পর্কে সে ছিল একেবারে রসপণ্ডিত। এ ক্ষেত্রে তার সততা একেবারে প্রশ্নাতীত। আমার কিন্তু এই বিশেষ ব্যাপারে ওর সঙ্গে মতপার্থক্য ছিলনা, কেননা ইতালীয় মদে আসক্তি আমারও ছিল। সুযোগ পেলেই ও মদ আমি প্রচুর পরিমাণে কিনে ফেলতাম।

যে সময়টায় মেলা আর নানা রকমের উৎসব নিয়ে হৈ হুল্লোড় শুরু হয় তেমনি সময় এক দিন সন্ধ্যেবেলায় আমি বন্ধুর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালাম। অনেকক্ষণ ধরেই ও মদ গিলছিল। আমাকে দেখে ভীষণ আন্তরিক ভাবে স্বাগত জানালো সে। নোংরা পোষাক পরে বসেছিল সে, আঁটসাট ডোরাকাটা জামাপ্যান্ট আর ঘণ্টা ঝুলোনো লম্বা টুপী পরা ওকে দেখে মনে হয়েছিল ওর সঙ্গে করমর্দন করাই আমার উচিত নয়।

আমি ওকে বললাম, দেখ ফর্চুনাটো, বড় ভাগ্যের কথা যে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তোমাকে আজ কিন্তু দেখতে খুব ভালো লাগছে। আমি এক পিপে মদ কিনেছি। ওরা বলছে ওটা এমোনটিল্লাডো। আমার কিন্তু বেশ সন্দেহ হচ্ছে।

ও বলল, এমোনটিল্লাডো? এই মেলার সময়? তাও আবার এক পিপে? অসম্ভব।

আমি বললাম, সন্দেহ আমারও আছে। আমি কিন্তু এমোনটিল্লাডোর দামই পুরোপুরি দিয়েছি তাও তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করে। তোমার দেখা পাওয়া গেলনা অথচ এদিকে দেরী করলে জিনিসটাই হাতছাড়া হয়ে যায়।

—এমোনটিল্লাডো!

—আমার কিন্তু সন্দেহ আছে।

—এমোনটিল্লাডো!

—পুরো দামটা কিন্তু দিতে হোল ওদের

—এমোনটিল্লাডো !

—তুমি ব্যস্ত ছিলে। আমি তাই গেলাম লুচেসির কাছে। কেউ এসব জিনিস ঠিক মত চিনতে যদি পারে তাহলে সে। সেই আমাকে বলে দেবে—

—লুচেসি শেরী আর এমোনটিল্লাডোর পার্থক্য কখনোই ধরতে পারেনা।

—বোকারাও কিন্তু বলবে যে মদ চেনার ব্যাপারে তারা তোমার সমকক্ষ।

—ঠিক আছে। চল যাই।

—কোথায় ?

—তোমার মাটির তলাকার মদের ভাঁড়ারে।

—না, বন্ধু না, তুমি ভালো মানুষ বলে চিরদিনই তোমার ওপর আমি জবরদস্তি করব এ কোন কাজের কথা নয়। তা ছাড়া তোমার জরুরী কাজও আছে আমি জানি। লুচেসি—

—না, আমার কোন জরুরী কাজ নেই। চল যাই।

—না, তা হয় না। আমি ঠিক জরুরী কাজের কথা বলছিনে। তোমার ভীষণ ঠাণ্ডা লেগেছে দেখছি। আমার মাটির তলাকার মদের ভাঁড়ারটা মারাত্মক রকমের স্যাঁতসেঁতে আর তা ছাড়া ওখানকার পরিবেশ রীতিমতো অস্বাস্থ্যকর।

—তা হোক গে। তবু চল আমরা যাই। এমন কিছু ঠাণ্ডা লাগেনি আমাকে। এমোনটিল্লাডো! আমি জানি কেউ ওটা তোমাকে জোর করে গছিয়েছে, আর লুচেসি ? শেরী আর এমোনটিল্লাডো বোঝবার শক্তিই তার নেই।

কথা বলতে বলতে ফর্চুনাটো ততক্ষণে আমার হাত ধরে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। কিছু জামাকাপড় চাপিয়ে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওর সঙ্গে বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। বাড়ীতে চাকর বাকর কেউ ছিল না। মেলা দেখবার জন্যে সবাই পালিয়েছিল। আমি বলেছিলাম ওদের যে পরদিন সকাল বেলা বাড়ী আসব। ওরা যেন

কিছুতেই বাড়ীর বাইরে না যায়, সে নির্দেশ বিশেষভাবেই দেওয়া ছিল। কিন্তু আমি একথাও জানতাম যে আমি পিছন ফিরতে না ফিরতেই ওরা সবাই হাওয়া হয়ে যাবে।

দুটো মশাল নিয়ে ফর্চুনাটোর হাতে তার একটা গুঁজে কামরাগুলো পেরিয়ে আমরা রওনা হলাম মদের ভাঁড়ারের দিকে। ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় ওকে বার বার সাবধান করে দিলাম আমি। শেষ পর্যন্ত আমার মাটির তলার ভাঁড়ারের স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে নেমে এলাম।

বন্ধু তখন স্থির হয়ে হাঁটতে পারছিলেন না আর মাথার টুপীর ঘণ্টাগুলো ঝুম্ ঝুম্ করে বেজে চলেছিল।

ও জানতে চাইল, কই, পিপেটা কোথায়? আমি বললাম, ওই যে ওখানে। কিন্তু দেওয়ালের গায়ে মাকড়শার সাদা রঙের জালগুলো দেখছ ঃ বন্ধু আমার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে মদের ঘোরে ঝিমিয়ে আসা চোখ দুটো দিয়ে তাকিয়ে রইল। একটু পরে সে বলল, নাইট্রিক এ্যাসিডের গন্ধ পাচ্ছি?

নাইট্রিক এ্যাসিড! কিন্তু তোমার এই কাশিটা কতদিন ধরে হচ্ছে?

খুক্, খুক্, খুক্—। বন্ধু অনেকক্ষণ কোন কথাই বলতে পারল না। বেশ কিছু সময় পরে সে বলল, না এমন কিছু নয় এটা।

আমি মন স্থির করে নিয়ে বললাম, চল আমরা ফিরে যাই। তোমার শরীর অনেক মূল্যবান। তুমি ধনী, সম্মানিত, প্রশংসিত, বহু মানুষের স্নেহ ভালোবাসায় তোমার জীবন পরিপূর্ণ আর তুমি এজন্যে পরম সুখীও বটে। অবশ্য এককালে এ সবের অনেক কিছুই আমার ছিল। তোমার কোন প্রকার ক্ষতি অসহনীয়। আমার কথা বাদ দাও। তুমি অসুস্থ হয়ে পড়লে পুরো দায়িত্ব আমার ওপর এসে পড়বে। সেটা ভালো নয়। চল আমরা ফিরে যাই। তাছাড়া লুচেসি যখন রয়েইছে—

—ও সব কথা থাক। এ কফকাশি কিছুই নয়, এতে আমার কোন ক্ষতি হবে না। আমি কফকাশিতে মরবো না।

—হ্যাঁ সেতো ঠিকই আর তাই না হওয়াও উচিত। দেখ, আমি তোমাকে ভয় পাইয়ে দিতে চাইনে কিন্তু স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্যে যে সব রকমের ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, এটা তো আর অস্বীকার করা যায় না। এই নাও, এই 'ম্যাডোক' আমাদের ঠাণ্ডা-লাগা থেকে রক্ষা করবে।

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাকে যেখানে অনেক বোতল রাখা ছিল সেখান থেকে একটা বোতল তাড়াতাড়ি নামিয়ে এনে খুলে ফেললাম। মদের বোতলটা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'নাও, ধরো'। ও বাঁকা চোখে আমাকে একবার দেখে নিয়ে বোতলটা তুলে ধরল মুখের কাছে। ওর বহু-পরিচিত মাথা নাড়বার ভঙ্গীটিও দেখলাম যার ফলে টুপীর ঘণ্টাগুলো আবার বেজে উঠল।

সে বলল, আমার আশে পাশে যারা মাটির তলায় ঘুমিয়ে আছে আমি তাদের উদ্দেশে মদ্যপান করছি।

—আর আমি পান করছি তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করে।

এরপর সে আমার হাত ধরে এগিয়ে চলতে চলতে বলল, এই ভাঁড়ারগুলো বেশ বড়।

আমি বললাম, আমাদের পরিবারটাও এককালে বেশ বড় ছিল। সংখ্যায় অনেক লোকজন।

—তোমাদের প্রতীক চিহ্ন যে কী ছিল ভুলে গেলাম।

—খোলা মাঠে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে, তার পায়ের তলায় পিষ্ট হচ্ছে একটা বিষধর সাপ আর সাপটার দাঁত মানুষটির পায়ের গোড়ালীতে আটকে আছে।

—কী যেন বক্তব্য একটা ছিল ওর সঙ্গে?

—অপরাধ করলে কোন মানুষই শাস্তির হাত থেকে রেহাই পায় না।

—বাঃ, বেশ ভালো।

ওর চোখে তখন মদের ফেনা চক্ চক্ করে উঠল আর মাথার ঘণ্টাগুলো বেজে উঠল ঝন্ ঝন্ করে। মদ আমার ওপরও কাজ করছিল। কল্পনাপ্রবণ হয়ে উঠছিলাম আমি। আমরা যে দিক দিয়ে এগিয়ে চলেছিলাম সেদিকে দেয়ালের পাশে অজস্র কঙ্কাল আর মদের কিছু পিপে। আমি ওর হাত ধরে এগিয়ে চলেছিলাম।

আমি হঠাৎ বলে উঠলাম, এই যে নাইট্রিক এ্যাসিড দেখছ, এগুলো কিন্তু বেশ বেড়ে ওঠে। এই ভাঁড়ারগুলোতে শ্যাওলার মতো এগুলো জমে যায়। আমরা তো নদীর তলায় দাঁড়িয়ে আছি। ওপর থেকে জল চুঁইয়ে পড়ে কঙ্কালগুলোর ওপর। যাক, খুব দেরী হয়ে গেছে। চল ফিরে যাই, তোমার আবার কফকাশি—

—ও কিছু নয়। কী বলছিলে বল, কিন্তু তার আগে আর একবার 'ম্যাডোক' হয়ে যাক।

আমি এবার ওর হাতের কাছে এক বোতল 'দ্য গ্রাভে' এগিয়ে দিলাম। এক নিশ্বাসে ও বোতলটা খালি করে ফেলল। ওর চোখে তখন আগুনের জ্যোতি। হেসে ও এমন একটা ভঙ্গী করে বোতলটা ওপরের দিকে ছুঁড়ে ফেলল যার সঠিক অর্থবোধ আমার পক্ষে সহজ হোল না। আমি ওর দিকে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকালাম, ও সেই অদ্ভুত ভঙ্গীটির পুনরাবৃত্তি করল।

সে বলল, বুঝলে কিছু ?

—না, বুঝলাম না।

—তাহলে তুমি সংঘের সদস্য নও।

—কেন ?

—তুমি ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্য নও।

—অবশ্যই, অবশ্যই আমি ওদের একজন।

—তুমি ? অসম্ভব। ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্য ?

—হ্যাঁ, ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্য।

—কোন চিহ্ন দেখাতে পারো ?

আমি পোষাকের ভাঁজের ভেতর থেকে একটা কর্ণিক বার করে

ওকে দেখালাম। তুমি ঠাট্টা করছ—বলল সে, যাই হোক, চল তোমায় এমোনটিল্লাডোর কাছে যাই।

—তাই চল, বলে আমি ওকে নিয়ে এগিয়ে চললাম। কর্ণিকটা ততক্ষণে পোষাকের মধ্যে পুরে ফেলেছি আমি। ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। ও আমার ওপর ভর দিয়েই হাঁটছিল। আমরা এমোনটিল্লাডোর খোঁজে চললাম। কতকগুলো নীচু খিলানের তলা দিয়ে গিয়ে আমরা একটু তলায় নেমে গেলাম। কিছুদূর এগিয়ে আবার একটু তলায় নামলাম। আমরা গিয়ে পৌঁছলাম একটা গুপ্ত কক্ষের মধ্যে। ওখানকার বাতাস দুর্গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছিল। সে বাতাসে আমাদের মশালগুলো চক্‌চক্‌ করে উঠল।

গুপ্ত কক্ষের এক প্রান্তে আরও ক্ষুদ্র একটা কক্ষ দেখা যাচ্ছিল। ওর দেওয়ালগুলোর গায়ে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত নরকঙ্কালের স্তূপ। তিনটে দেওয়ালের গায়েই এই দৃশ্য। চতুর্থ দেওয়ালের গা থেকে কঙ্কালগুলো মেঝের মাঝখানে ছড়িয়ে পড়েছিল। এক জায়গায় অবশ্য ওগুলো মেঝের উপরেই একরকম স্তূপ হয়ে গিয়েছিল। যে দেওয়ালটার গা থেকে কঙ্কালগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল তারই গায়ে তিন ফুট চওড়া, চার ফুট গভীর, ছ'সাত ফুট লম্বা একটা তাকের মত দেখা যাচ্ছিল। ওটা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে তৈরী হয়েছিল বলে মনে হোল না। দুটো থামের মাঝখানে পেছনের গ্র্যানাইট দেওয়ালের গায়ে ওই রকম একটা তাক হয়ে গিয়ে থাকবে।

ফর্চুনাটো তার মৃদু আলোর মশালটা তুলে ধরে বৃথাই ওখানে খোঁজ করছিল। আলোর মৃদু রেখা কক্ষটার শেষ প্রান্তে মোটেই পৌঁছচ্ছিল না।

আমি বললাম, আর একটু এগিয়ে চল। এমোনটিল্লাডো ঐখানেই আছে। লুচেসি বলে—

—ওটা একটা মূর্খ। বলে উঠল বন্ধুটি। টলতে টলতে সে চলল এগিয়ে আর আমি চললাম তার পেছনে। পর মুহূর্তে সে গিয়ে

পৌঁছল কক্ষের শেষ প্রান্তে, পাথরের দেওয়ালের কাছে। ওখানে গিয়ে ও বোকার মত দাঁড়িয়ে পড়ল। পর মুহূর্তে আমি ওকে গ্র্যানাইট পাথরের সঙ্গে বেঁধে ফেললাম। পাথরের গায়ে দু'ফুট তফাতে পাশাপাশি দুটো লোহার গজাল লাগানো ছিল। একটা থেকে একটা ছোট শেকল আর অন্যটাতে একটা চাবি ঝোলানো ছিল। ওর কোমরের ওপর দিয়ে শেকলটা ঘুরিয়ে নিয়ে তালা লাগিয়ে দিতে কয়েক সেকেণ্ড লাগল মাত্র। ও এতই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল যে বাধা দেবার মত শক্তিও তার ছিল না। তালা থেকে চাবিটা বার করে নিয়ে আমি সে কক্ষ থেকে সরে এলাম।

ওকে বললাম, দেওয়ালটা বড্ড স্যাঁতসেঁতে, কিন্তু উপায় নেই। আমি অবশ্য তোমাকে ফিরে যাবার জন্যে শেষ অনুরোধ করব। কী, ফিরবেনা? তাহলে তোমাকে এখানে ফেলে যাওয়া ছাড়া আমার গত্যন্তর নেই।

বন্ধুর বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটেনি। সে মোহগ্রস্তের মত উচ্চারণ করল, এমোনটিল্লাডো!

---হ্যাঁ, এমোনটিল্লাডো।

কথা বলতে বলতে আমি কঙ্কালগুলো সরিয়ে ওর তলা থেকে কয়েকখানা পাথর আর কিছু মশলা বার করে ফেললাম। এর পর কর্ণিকটার সাহায্যে পাথর আর মশলা দিয়ে এই ছোট্ট কক্ষটার প্রবেশ-পথ বন্ধ করে ফেললাম।

একপ্রস্থ পাথর বসানো শেষ করার পূর্বেই বুঝতে পারলাম ফর্চুনাটোর মদের নেশা অনেকখানি কেটে গেছে। এর প্রথম প্রমাণ পেলাম ওর মৃদু আর্তনাদ থেকে। কক্ষের গহ্বর থেকে সে আর্তনাদ শুনে বুঝতে পারলাম যে তা মাতালের কণ্ঠস্বর নয়। বেশ কিছুক্ষণ নীরবতায় কেটে গেল এরপর। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ স্তর পাথর বসানোর পরই শেকলের প্রবল ঝন্ ঝন্ শব্দের অনুরণন অনুভব করলাম। বেশ কয়েক মিনিট ধরে খুব তৃপ্তির সঙ্গে আমি তা উপভোগ করলাম। এরপর একটু সময় কঙ্কালস্তূপের ওপর বসে

রইলাম আমি। শেকলের শেষ ধ্বনিটুকু মিলিয়ে যাবার সঙ্গে আবার উঠে তৎপরতার সঙ্গে পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম স্তর পাথর বসিয়ে আমার কাজ নিপুণভাবে শেষ করে ফেললাম। নতুন দেওয়ালটা তখন প্রায় আমার বুক-সমান উঁচু হয়ে উঠেছে। মশালটা উঁচু করে ধরে ওপাশের মূর্তিটাকে একবার দেখে নিতে চাইলাম আমি।

শৃঙ্খলাবদ্ধ মানুষটার গলা থেকে এমন একটা তীব্র আর তীক্ষ্ণ আর্তনাদ বেরিয়ে এলো যে আমি কয়েক পা পিছিয়ে এলাম নিজেরই অজান্তে। একটু সঙ্কোচ, একটা শিহরণ অনুভব করলাম যেন। একটা তলোয়ার খাপ থেকে বার করে নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালাম খানিকক্ষণ। একটু পরেই কিন্তু স্বাভাবিকতা ফিরে এলো আমার মধ্যে। যে দেওয়াল আমি গড়ে তুলছিলাম হাত দিয়ে তার দুর্ভেদ্যতা অনুভব করে বড় তৃপ্ত হলাম আমি। এরপর আবার আমার কাজ শুরু করলাম। ওদিকের আর্তনাদের প্রত্যুত্তরে আমিও চীৎকার করতে থাকলাম—আরও বেশী করে, তীব্রতর ভাবেই। ওর আর্তনাদ আমার চীৎকারের প্রচণ্ডতার মধ্যে সম্পূর্ণভাবেই ডুবে গেল। সব কিছু নিস্তব্ধ হয়ে গেল এর পর।

তখন প্রায় রাত দুপুর। আমার কাজও শেষ হয়ে আসছিল। অষ্টম, নবম আর দশম স্তরের গাঁথনীও শেষ হয়ে গিয়েছিল। এর পরের একটা স্তর শেষ করে তার ওপর একটা মাত্র পাথর বসিয়ে দিয়ে পলস্তারা লাগানোটুকু মাত্র তখন বাকী। পাথরটা বেশ ভারী। ওটা নিয়ে আমি টানাহ্যাঁচড়া করছিলাম। ওটাকে তার জায়গায় যখন প্রায় এনে বসিয়েছি ঠিক তখনই ভেতর থেকে মৃদু কণ্ঠের হাসির শব্দে আমার শরীর শিউরে উঠল। মাথার চুলগুলো সবই যেন খাড়া হয়ে উঠল আমার। তার পরমুহূর্তেই করুণ কণ্ঠস্বরে কিছু কথা শুনতে পেলাম আমি। ওটা ফর্চুনাটোর গলার স্বর বলে চিনে নিতে অবশ্য একটু বিলম্ব হয়েছিল আমার। শুনলাম, হাঃ, হাঃ, হাঃ, এ রসিকতাটা কিন্তু মন্দ নয়।—বেশ উচ্চস্তরের রসিকতাই বলতে হবে। ও-বাড়ীতে এ নিয়ে রসিকতার অনেক

বেশী সুযোগ এরপর পাওয়া যাবে। হেঃ, হেঃ, হেঃ, আমাদের এই মদ খাওয়া নিয়েই রসিকতা, হাঃ, হাঃ, হাঃ।

আমি বলে উঠলাম, এমোনটিল্লাডো!

হাঃ, হাঃ, হাঃ, এমোনটিল্লাডোই বটে। কিন্তু আমরা কি যথেষ্ট দেরী করে ফেলিনি? ওদিকে লেডি ফর্চুনাটো আর অন্যেরা আমাদের জন্য নিশ্চয়ই অপেক্ষা করে আছেন। চল, এবার আমরা ফিরে যাই।

—হ্যাঁ, যাওয়া যাক্ এবার।

—ঈশ্বরের দোহাই।

—ঈশ্বরের দোহাই।

এরপর বেশ খানিক সময় অপেক্ষা করেও কোন কথা শুনতে পেলাম না। বেশ অধৈর্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, ফর্চুনাটো! কোন উত্তর শোনা গেল না। আবার ডাক দিলাম, ফর্চুনাটো! কোন উত্তর নেই। যে একটুখানি ফাঁক ছিল গাঁথনীর মধ্যে তার ভেতর দিয়ে মশালটা গলিয়ে ওপাশে ফেলে দিলাম আমি। এর পরিবর্তে ও দিক থেকে শেকলের আর ঘণ্টার ঝন্ ঝন্ শব্দ ভেসে এলো শুধু। ভূগর্ভস্থ সে কক্ষটির স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে অসুস্থ বোধ করছিলাম। কাজ যেটুকু করার ছিল, সেটি তাই তাড়াতাড়ি শেষ করতে চাইলাম আমি। শেষ পাথরটিকে নির্দিষ্ট জায়গায় বসিয়ে আমি তার ওপর পুরু পলস্তারা লাগিয়ে দিলাম। এই নতুন গাঁথনীর গায়ে পুরোনো কঙ্কালের একটা প্রাচীর গড়ে তুললাম এরপর। অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে কোন মানবসন্তান ওদের স্থানচ্যুত করেনি। শান্তিতে থাকুক ওরা।

আশ্চর্য মানসিকতা

আমরা পাহাড়ের চূড়ায় বিপজ্জনকভাবে একটি প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের দৃষ্টি দূরবর্তী তলদেশে নিবদ্ধ। এর ফলে আমরা অসুস্থ আর অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ি। আসন্ন বিপদ থেকে মুক্তিকামনাটিই প্রবল হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের সে অবস্থা বর্ণনাতীত। ধীরে ধীরে আমাদের ভীতি, অসুস্থতা আর অপ্রকৃতিস্থতা স্তিমিত হয়ে বিশেষ এক ধরণের অনুভূতিতে পরিণত হয়। আরব্যরজনীর মধ্যে বোতল থেকে ভৌতিক আবির্ভাবের যে বর্ণনা আছে অনেকটা তারই মত পূর্ববর্ণিত অনুভূতি আমাদের চিন্তার মধ্যে ধীরে ধীরে একটা রূপ পরিগ্রহ করে। গল্প-কাহিনীর মধ্যে বর্ণিত ভৌতিক মূর্তির তুলনায় এই চিন্তালগ্নরূপটি কিন্তু অনেক বেশী ভয়ঙ্কর। সেই ভয়ঙ্কর একধরণের আনন্দ-বেদনার সংমিশ্রনে যে ভীষণতা লাভ করে তার সামগ্রিক প্রভাবে আমাদের অস্থিমধ্যস্থিত মজ্জাও হিম হয়ে আসে। পর্বতশিখর থেকে পতনের মুহূর্তে আমাদের অনুভূতির স্বরূপটি এই শ্রেণীর। এই পতন, ধ্বংসের অনিবার্য পরিণতির দিকে এই দুর্বার যাত্রা প্রকৃত মৃত্যুর চাইতেও জঘন্য ও বীভৎস। এর চাইতে জঘন্যতর মৃত্যু অকল্পনীয়। হয়ত এই জন্যেই পতনের মুহূর্তে মৃত্যুকামনাটি এত তীব্র হয়ে ওঠে। আমাদের ভাবজগতে এর চাইতে ভয়ঙ্কর এবং ধৈর্যহীন আবেগ আর কিছু নেই।

এই অনুভূতির স্বরূপ পরীক্ষা করলে বোঝা যাবে যে এ সবই চরিত্র-বিকৃতির লক্ষণ। কাজটা করা উচিত নয় একথা জানি বলেই যেন কাজটা করার জন্যে আমাদের আগ্রহ তীব্র হয়ে ওঠে। এর পেছনে বোধগম্য কোন রকমের যুক্তিই নেই। সম্ভবত আমাদের ভেতরে যে অস্থির বুদ্ধি আছে এর মধ্যে তারই প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

আমি এখানে কেন আছি তার কৈফিয়ত হিসেবে আমার কথাগুলোকে গ্রহণ করলে আমার বন্দীদশার একটা অর্থ বুঝতে পারা যাবে। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীর সঙ্কীর্ণ কক্ষের মধ্যে আমার উপস্থিতির কারণগুলো পূর্বাপর চিন্তা না করতে পারলে আমাকে হয়ত উন্মাদই ভাববেন আপনারা।

যে পরিমাণ সুচিন্তিত পরিকল্পনার সাহায্যে বর্তমান কর্মটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা তুলনাহীন। হত্যা করার পূর্বে তার উপায় সম্পর্কে আমি সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস চিন্তা করেছি। হাজারটা পথ আমি এই জন্যেই পরিত্যাগ করেছি যে সেগুলোর ক্ষেত্রে ধরা-পড়ার সম্ভাবনা ছিল প্রবল। শেষে একটা ফরাসী পত্রিকায় মাদাম পিলোর মারাত্মক অসুস্থতার কথা পড়ি। আকস্মিকভাবে একটা মোমবাতি বিষাক্ত হয়ে যাওয়ার দরুণ এটা ঘটে। কাহিনীটি পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি পথের সন্ধান পেয়ে যাই। আমি যাকে হত্যা করতে চাইছিলাম রাত্রে বিছানার মধ্যে কিছু পড়াশোনা করার অভ্যাস ছিল তার। আর এ খবরও আমার জানা ছিল যে তার শয়নকক্ষ অপরিসর আর বায়ুচলাচলের ব্যবস্থা সেখানে অপ্রচুর।

যাক্, এসব ছোটখাটো অপ্রয়োজনীয় বর্ণনা দিয়ে লাভ নেই। যে কোন উপায়ে হোক্ আমি ওর বিছানার পাশে রাখা বাতিদান থেকে বাতিটি সরিয়ে আমার নিজের তৈরী একটা বাতি সেখানে বসিয়ে দিতে পেরেছিলাম। পরের দিন বিছানায় তার মৃতদেহ পাওয়া যায়। করোনারের রিপোর্টে এ মৃত্যুকে ঈশ্বরদত্ত স্বাভাবিক মৃত্যু বলেই বর্ণনা করা হয়েছিল।

তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবার পর বেশ কয়েক বছর আনন্দেই কেটে গেল। কোন দিন যে আমার অপরাধের সন্ধান কেউ জানতে পারবে ঘুণাক্ষরেও সে চিন্তা আমার মস্তিষ্কে স্থান পায়নি। মারাত্মক সেই মোমবাতির অবশিষ্টাংশ আমি সযত্নে নষ্ট করে ফেলেছিলাম। আমাকে দোষী সাব্যস্ত করার বা সাজা দেবার

মত কোন সাক্ষ্যপ্রমাণই আমি রাখিনি। আমি নিরাপদ—এই চিন্তা আমাকে কী পরিমাণ পরিতৃপ্তি দিয়েছিল তা বলে বোঝাতে পারবো না। এই আত্মতৃপ্তি নিয়ে কেটে গেল দীর্ঘকাল। সম্পত্তির উত্তরাধিকার যে সব পার্থিব ভোগবিলাসের আনন্দ আমাকে এনে দিয়েছিল, এ আনন্দ তার চাইতেও বড়।

কিন্তু এর পরই আমার জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হোল। ধীরে ধীরে আমার চিন্তার মধ্যে এক ধরণের ভীতিপ্রদ ও যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি গড়ে উঠল। আমার মন থেকে ওটাকে দূর করতে পারছিলাম না বলেই বড় বেশী যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছিল সে চিন্তা। এক মুহূর্তের জন্যেও তাকে আমি দূরে রাখতে পারছিলাম না। স্মৃতির মধ্যে যা সঞ্চিত ছিল অত্যন্ত সংগোপনেই তাকে জাগিয়ে তুলছিল কোন গানের একটা কলি বা কোন নাটকের একটি ছোট্ট দৃশ্য। আর যন্ত্রণায় আমি কাতর হয়ে পড়ছিলাম। সেই গান আর নাটক যত উচ্চশ্রেণীর হোক না কেন যন্ত্রণার পরিমাণ তাতে হ্রাস পেতো না। ধীরে ধীরে আমার নিরাপত্তার চিন্তা আমার মনকে অধিকার করে বসল আর কখনো কখনো নীচু গলায় নিজেকেই নিজে সান্ত্বনা দিতে থাকলাম—'তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ'।

পথে বেড়ানোর সময় একদিন মনে হোল সেই স্বগতোক্তির অভ্যাস আর একটু বেড়েছে—আমার কণ্ঠস্বর উচ্চতর হয়েছে আর বক্তব্যেরও কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। এখন আমি মাঝে মাঝে বলছি, আমি যদি নিজে মূর্খের মতো খোলাখুলি ভাবে অপরাধ স্বীকার না করি, আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ।

হঠাৎ মনে হোল এই কথাগুলো উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরের মধ্যে একটা হিমপ্রবাহ বয়ে গেল। এই ধরণের বিকৃত অনুভূতির অভিজ্ঞতা আমার ছিল তাই একে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলাম প্রাণপণ শক্তিতে। বার বার মনে হোল নিহত ব্যক্তির আত্মা আমাকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে ইঙ্গিত করছে আর

সম্ভবত কোন এক দুর্বল মুহূর্তে আমি অপরাধ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করেই বসব।

এই চিন্তাকে প্রথমে সবলে পরিহার করতে চাইলাম আর পথচলার গতি দিলাম বাড়িয়ে। কিন্তু সে চিন্তা ক্রমশ প্রবলতর হয়ে উঠল আর আমি একসময় দৌড়োতে শুরু করলাম। পরপর কতকগুলো চিন্তা আমাকে উত্তেজিত করে তুলল আর নিজের ওপর কর্তৃত্বও যেন ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যেতে লাগল। গতিবেগ তখন আরও বেড়েছে। পথের জনস্রোত ভেদ করে উন্মাদের মত তখন প্রায় দৌড়ে চলেছি আমি। পরমুহূর্তে জনসাধারণের মধ্যেও ভীতির সঞ্চার হোল আর তারাও আমাকে অনুসরণ করতে শুরু করল।

বুঝলাম, নিয়তি আমাকে চরম অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছে। আমি যদি আমার জিহ্বাটিকে ছিন্ন করে ফেলতে পারতাম, হয়ত এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে যেতাম। কিন্তু আমার কানে কানে কে যেন নির্মমকণ্ঠে কী বলে উঠল, আমার গতি মন্দীভূত হোল। দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। পেছন ফিরে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে চাইলাম সহজভাবে কিন্তু পরমুহূর্তেই শ্বাসরোধ হয়ে আসার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়লাম। আমি যেন একই সঙ্গে অন্ধ, বধির আর মূর্ছাহত হয়ে গেলাম আর ঠিক তখনই কে যেন আমার পেছনে প্রবল আঘাত করল। সুদীর্ঘকালীন অবরুদ্ধ গুপ্ত তথ্য সম্পূর্ণভাবেই প্রকাশিত হয়ে গেল।

ওরা বলে, আমি নাকি খুব স্পষ্টভাবে একটু দ্রুতগতিতে সব কথা জানিয়েছিলাম। পাছে বক্তব্য শেষ করার আগে কেউ বাধা দেয় তাই আবেগের সঙ্গে আমি নাকি সবটুকু তাড়াতাড়ি বলে নিয়েছিলাম। আর তার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ আজ আমার নিয়তি যূপকাষ্ঠের সঙ্গে নিবদ্ধ হয়ে গেছে। আমার আইনসঙ্গত বিচারের জন্য যেটুকু বক্তব্য প্রকাশ করা দরকার তা করার পরই আমি নাকি সংজ্ঞাহীন হয়ে যাই।

আর কিছু বলার কি প্রয়োজন আছে? শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় আমি এখানে আছি। আগামী কাল এ শৃঙ্খল আমার থাকবে না—কিন্তু তখন আমি থাকবো কোথায়?